মুকাশাফাতুল-কুলূব

বা

আত্মার আলোকমণি

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল

হুজ্জাতুল ইসলাম

ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-গায্যালী (রহঃ)

অনুবাদ

মুফ্তী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

মুহাদ্দিস, জামেয়া আরাবিয়্যাহ্, ফরিদাবাদ, ঢাকা

খতীব, ১নং সিদ্দিক বাজার জামে মসজিদ, ঢাকা

দারুল ইফ্তা প্রকাশনী

১নং সিদ্দিক বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ

(নওয়াবপুর রোড সংলগ্ন ঢাকা হোটেলের বিপরীতে)

ইসলামী সাহিত্যের গৌরব, বিশিষ্ট জ্ঞানতাপস, মাসিক মদীনা সম্পাদক
মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের

ভূমিকা

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক লোক–শিক্ষক হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবূ হামেদ মুহাম্মদ আল–গাযালী (রাহঃ)–রচিত মুকাশাফাতুল–কুলূব একটা মহামূল্যবান গ্রন্থ। একশত এগারটি অধ্যায়ে সমাপ্ত এই বিরাটায়তন গ্রন্থটি ইমাম সাহেবের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'এহ্য়াউ উলুমুদ্দীন'–এর প্রায় সমপর্য্যায়ের। এ অমূল্য গ্রন্থটি আমাদের দেশে একপ্রকার অপরিচিত রয়ে গিয়েছিল। বৈরুত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শায়খ মুহাম্মদ রশীদ আল–কোব্বানী দুষ্প্রাপ্য সেই গ্রন্থটি সম্পাদনা করে সম্প্রতি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছেন। ফলে ইমাম গাযালীর (রাহঃ) এ গ্রন্থটির সাথেও আধুনিক বিশ্বের পরিচিতি লাভ সহজ হয়েছে।

ইমাম গাযালীকে (রাহঃ) হিজরী পঞ্চম শতকে প্রকাশিত হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা অত্যুজ্জ্বল মোজেযারূপে চিহ্নিত করা হয়। কারণ, প্রাথমিক পাঁচশো বছরের সময়কালের মধ্যে অর্জিত অকল্পনীয় পার্থিব সমৃদ্ধি মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টিকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ়করণের কথা যখন অনেকটা ভুলিয়ে দিয়েছিল, ঠিক সেরূপ একটা ক্রান্তিকালে ইমাম গাযালীর (রাহঃ) আবির্ভাব ঘটে। তাঁর সাধনাঋদ্ধ ক্ষুরধার লেখনী পথহারা মুসলিম উম্মাহকে নতু করে জাগিয়েছিল। আর সেটা ঘটেছিল আত্মার জাগরণ। বলা হয় যে, ইমাম গাযালীর (রাহঃ) লেখনী দ্বারাই পরবর্তীকালে নূরুদ্দীন জঙ্গী সালাহউদ্দীন আইয়ুবী প্রমুখ দরবেশ রাজন্যবর্গের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। ইতিহাস যাঁদে

করেছে উম্মতের শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে। ইমাম গাযালীর (রাহঃ) নির্দেশেই তাঁর জনৈক সাগরেদ মাগরেব বা মরক্কোয় একই ইসলামী দল গঠন ও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন।

ইমাম গাযালীর (রাহঃ) দর্শন পবিত্র কোরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ নির্ভর। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অন্তরমধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় ও আখেরাতের জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ একীন সৃষ্টি না করা পর্যন্ত পশুজীবনের সাথে মানুষের পার্থক্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। ভয় ও একীন ছাড়া মানুষ হিংস্র পশুর চাইতে কোন অংশে কম তো নয়ই বরং বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণী হওয়ার কারণে অবিশ্বাসী মানব সন্তান হিংস্র পশুর চাইতে অনেক বেশী মারাত্মক হয়ে থাকে। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত মনুষ্যত্বের জাগরণ শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা গতানুগতিক ধর্মাচরণ দ্বারা সম্ভবপর নয়। কারণ, মানুষের শত্রু তার নিজের মধ্যেই অবস্থান করে। নাফ্‌স রূপী সে শত্রুই শয়তানের বাহন। সুতরাং সে শত্রুর মুখে লাগাম এঁটে ওটা খোদাভীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব। এ উপলব্ধি তে উদ্বেলিত হয়েই যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীপুরুষ গাযালী (রাহঃ) রাজকীয় পদমর্যাদা এবং বর্ণাঢ্য জীবন পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশের যাত্রী হয়েছিলেন। সে যাত্রারই অমৃতময় ফসল তাঁর রচিত সবগুলি অমর গ্রন্থ।

আধ্যাত্মিকতা কি এবং তা অর্জন করার পথই বা কোন্‌টি তা অনুধাবন করার জন্য ইমাম গাযালীর গ্রন্থাবলী পাঠ করাই যথেষ্ট। জীবনের তাৎপর্য ও তা উপভোগ করার যেসব পদ্ধতি তিনি বলে গেছেন, জীবনপথে চলতে গিয়ে যে সব বৈরী শক্তির মোকাবেলা করতে হয়, সেগুলিকে যেভাবে তিনি চিহ্নিত করেছেন, তা সর্বকালেই চিরনতুন হয়ে থাকবে। প্রায় হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এখনও গাযালীর লেখা পুরাতন হয়নি। দেশ–কালের সীমানা পেরিয়ে যারাই তাঁর লেখার সাথে পরিচিতি লাভ করতে চায়, তাদের চোখেই সর্বপ্রথম যে সত্যটি ধরা পড়ে, তা হচ্ছে, ইমাম সাহেব যেন সে যুগ এবং সে যুগের লোকগুলিকে লক্ষ্য করেই কথা বলছেন। মানবমনের এতটা গভীরে অন্য কোন দার্শনিক বা লোকশিক্ষক প্রবেশ করতে পেরেছেন বলে আমার জানা নাই। তাই ইমাম গাযালীর রচনা পাঠ করে কোনদিনই রেখে দেওয়া যায়

না। যতই পড়া যায়, ততই যেন আত্মার ক্ষুধা বাড়তে থাকে। মনে হয় প্রতিটি মানুষের নিজস্ব চিন্তা–চৈতন্য নিয়েই বুঝি তিনি কথা বলেছেন।

বাংলাভাষায় ইমাম গাযালীর (রাহঃ) বেশ কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এখনও এমন অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়ে গেছে, যেগুলির নামও এদেশে অনেকের জানা নাই। স্নেহভাজন মাওলানা মুফতী উবায়দুল্লাহ্‌ সাহেব বছরখানেক আগে বিশেষ একটি প্রশিক্ষণ উপলক্ষে কায়রোতে কিছুকাল অবস্থানের সুযোগে সেরূপ কয়েকখানা দুষ্পাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। তন্মধ্যে 'বিদায়াতুল–হিদায়াহ্‌' নামক পুস্তকখানি তিনি ইতিপূর্বে অনুবাদ করে বাংলাভাষাভাষী পাঠকগণকে উপহার দিয়েছেন। 'মুকাশাফাতুল–কুলূব' তাঁর দ্বিতীয় উপহার। আলোচ্য গ্রন্থটি নিয়ে বিস্তর তাত্ত্বিক আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এতে যেন ইমাম সাহেব পাঠকগণকে সহজ–সরল পন্থায় আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। বইটি পাঠ করলে মনে হয়, পরম প্রিয় মাওলার সান্নিধ্য লাভ করাটাই বুঝি বান্দার নিতান্তই সহজাত একটা সাধনা। এ পথে জটিলতা বা রহস্যময়তা বলতে বুঝি কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই।

আমাদের দেশ আজ আধ্যাত্মিকতার নানা দাবী–দাওয়ার সয়লাবে টই–টুম্বুর হয়ে রয়েছে। কত কিছিমের মারেফাত–চর্চা যে এদেশে হচ্ছে, তা শুমার করে শেষ করাও কঠিন। আর এসব নামধারী মারেফাতসেবীদের প্রধান শিকারই হচ্ছে প্রকৃত ধর্মজ্ঞান বর্জিত সমাজের শিক্ষিত–উচ্চবিত্ত শ্রেণীটা।

উম্মতের মধ্যে যে যুগে যে ধরনের গোমরাহীর প্রাদুর্ভাব বেশী হয়, দ্বীনের সেবক আলেম সমাজের দৃষ্টি আল্লাহ পাক সে সবের প্রতিবিধান–চিন্তার দিকে ফিরিয়ে দেন। বিগত ইতিহাসের বহু ক্রান্তিলগ্নে এ সত্যটি বারবার প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইমাম গাযালী (রাহঃ) পরিবেশিত অমৃতধারার প্রয়োজনীয়তা বড় বেশী বলে মনে করি। আনন্দের বিষয় যে, এ যুগের কিছুসংখ্যক প্রতিভাদীপ্ত আলেমের শ্রম–সাধনা গাযালীর রচনাবলী বাংলাভাষায় প্রকাশ করার প্রতি নিয়োজিত হয়েছে। মাওলানা মুফতী উবায়দুল্লাহ তাঁদেরই

একজন। এলেম ও আমলের মাপকাঠিতে গাযালীর (রাহঃ) রচনাবলী অনুবাদ করার মত যোগ্য কর্মী বলেই আমি তাঁকে বিবেচনা করি। আমার আন্তরিক দোয়া, আল্লাহ পাক যেন তাঁর প্রতিভাদীপ্ত যৌবন ইমাম গাযালীর (রাহঃ) রূহানী ফয়যের দ্বারা আরও কর্মোদ্দীপ্ত করে তুলেন।

সমাজের বর্তমান সর্বগ্রাসী অবক্ষয় দৃষ্টে দুর্ভাবনাগ্রস্ত সুধীমণ্ডলীর প্রতি আবেদন, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনীষী ইমাম গাযালীর (রাহঃ) রচনাবলীর মধ্যে তাঁরা বর্তমান সমস্যার সমাধান তালাশ করে দেখতে পারেন। রোগের চিকিৎসা যেমন পরীক্ষিত ঔষধ দ্বারা করতে হয়, তেমনি রুগ্ন সমাজের চিকিৎসাও আত্মার গভীরে বিপ্লব সাধনের মাধ্যমেই কেবল সম্ভব। এক্ষেত্রে গাযালীর শিক্ষা বহু পরীক্ষিত একটি মহৌষধ তাতে সন্দেহ নাই।

আল্লাহপাক আমাদিগকে হক তালাশ করে তা অনুসরণ করার তওফীক দান করুন। আমীন!!

বিনয়াবনত

মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা

৩১-১২-৮৮

সূচীপত্র

* * *

অধ্যায় ঃ ৪৮

নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ۝

"নিশ্চয় মুমিনদের উপর নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা ফরয।" (নিসা ঃ ১০৩)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার উপর ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি সেগুলোর হক আদায় করবে এবং হাল্কা মনে করে বরবাদ করবে না, তার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে তা না করবে, তার জন্য আল্লাহ্র নিকট কোন প্রতিশ্রুতি নাই। ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন আর ইচ্ছা করলে তাকে বেহেশ্তেও প্রবেশ করাতে পারেন।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ হচ্ছে এরূপ যে, তোমাদের কারও বাড়ীর সম্মুখে যদি একটি স্বচ্ছ নহর থাকে এবং তাতে প্রচুর পানিও থাকে, সেখানে দৈনিক পাঁচবার যদি সে গোসল করে, তবে কি তার শরীরে সামান্যতম ময়লাও অবশিষ্ট থাকবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ না, সামান্যতম ময়লাও অবশিষ্ট থাকবে না। হুযূর বললেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও ঠিক তদ্রূপ ; অর্থাৎ পানির দ্বারা যেমন শরীরের ময়লা দূর হয়ে যায়, নামাযের দ্বারাও ঠিক তেমনি মানুষ পাপের ময়লা হতে স্বচ্ছ-পবিত্র হয়ে যায়।'

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ 'নামাজ এক ওয়াক্ত থেকে অপর ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত পাপসমূহের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ

হয় ; যদি কবীরা গুনাহ্ হতে বেঁচে থাকা হয়।' যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ط

"নিশ্চয় নেক আমল দূর করে দেয় পাপসমূহকে।" (হূদ ঃ ১১৪)

উপরোক্ত আয়াতে يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ শব্দের মর্ম হলো, নেক আমল অশুভ কাজের পঙ্কিলতা এমনভাবে দূর করে দেয়, যেন ইতিপূর্বে তা মোটেই ছিল না।

বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি জনৈকা স্ত্রীলোককে চুম্বন করেছিল, অতঃপর সে এসে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে সংবাদ দিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ط إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ط

('নামায কায়েম কর দিনের দুই অংশে এবং রাত্রের কিছু অংশে। নিশ্চয় নেক আমল দূর করে দেয় পাপসমূহকে') তখন সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই আয়াতের বিষয়বস্তু কি আমার জন্য বিশেষভাবে? আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না, এ বিষয় আমার উম্মতের সকলের জন্যই ব্যাপক।

হযরত আবূ উমামাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হদ্দের (শরয়ী দণ্ডের উপযুক্ত) কাজ করেছি, সুতরাং আমার উপর শাস্তি প্রয়োগ করুন। একথা সে একবার কি দুইবার বলেছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটি কোথায়? সে দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হাজির। হুযূর বললেন ঃ তুমি কি পূর্ণাঙ্গ

উযূ করে আমাদের সাথে নামায আদায় কর নাই? লোকটি বললো ঃ হাঁ, আদায় করেছি। হুযূর বললেন ঃ 'তোমার কৃত গুনাহ্ মাফ হয়ে গেছে ; মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তুমি যেরূপ নিষ্পাপ ছিলে, এখন তুমি সেরূপ নিষ্পাপ'।' অতঃপর এই আয়াতখানি নাযিল হয় ঃ 'নামায কায়েম কর দিনের দুই অংশে এবং রাতের কিছু অংশে। নেক আমল গুনাহ্সমূহ মাফ করিয়ে দেয়।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'আমাদের এবং মুনাফেকদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায় ফজর ও ইশার জামাতে উপস্থিতির দ্বারা ; তারা এ দুই ওয়াক্তের জামাতে উপস্থিত হয় না। তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ 'নামায দ্বীনের খুঁটি বা শিকড়, যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করলো, সে দ্বীনকে ধ্বংস করলো।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সর্বোত্তম কাজ কোন্‌টি ? তিনি উত্তর করলেন ঃ ঠিক সময়ে নামায পড়া।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ পবিত্রতা ও উযূ সহকারে সঠিক সময়ে পাবন্দির সাথে নামায আদায় করবে, কেয়ামতের দিন সেই নামায তার জন্য জ্যোতিঃ, প্রমাণ ও মুক্তিস্বরূপ হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করবে না, কেয়ামতের দিন তার হাশর ফেরাউন ও হামানের সাথে হবে।'

হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ 'নামায জান্নাতের চাবিকাঠি।' তিনি আরও বলেন ঃ 'তওহীদ বা আল্লাহ্র একত্বের পর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ইবাদত হলো নামায। নামাযের চেয়ে আরও অধিক শ্রেষ্ঠ কোন ইবাদত যদি হতো, তবে ফেরেশ্‌তাগণও তাতে শরীক হতেন। অথচ, ফেরেশ্‌তাগণের অনেকেই রুকূ অবস্থায়, অনেকেই

---

(১) ওহী অথবা অন্য কোনরূপে হুযূর জ্ঞাত হয়েছিলেন যে, তার অপরাধ কি ছিল। তাই, সে সম্পর্কে তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। তার সে অপরাধ অকৃতভাবে হদ্দের যোগ্য ছিল না। যদিও সে মনে করেছিল তা হদ্দের যোগ্য। তাই, নামাযের দ্বারা তা মাফ হয়ে গেল।

সেজদাবস্থায়, অনেকেই দাঁড়ানো অবস্থায় এবং অনেকেই বসা অবস্থায় ইবাদতরত রয়েছেন।'

হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগ করলো, সে কুফ্‌র করলো।' অর্থাৎ ঈমানের বাঁধ খুলে যাওয়ার কারণে বা স্তম্ভ ধ্বসে যাওয়ার কারণে কুফ্‌রের অতি নিকটবর্তী হয়ে গেল।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায ত্যাগ করে, তার থেকে আল্লাহ্‌র রাসূলের নিরাপত্তা উঠে যায়।'

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে নামাযের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তরে নামাযের ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে, প্রতি কদমে তার আমলনামায় একটি নেকী লেখা হয় এবং পরবর্তী কদমে একটি গুনাহ্ মোচন করা হয়। ইকামতের আওয়ায শোনার পর নামাযের দিকে অগ্রসর না হয়ে পশ্চাদপদ হওয়া তোমাদের মোটেই উচিত নয়। তোমাদের মধ্যে যার গৃহ অধিক দূরত্বে আল্লাহ্‌র কাছে তার পুরস্কারও অধিক। কারণ মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতে তার পদচারণার সংখ্যা বেশী।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

ما تقرب العبد إلى الله بشيء أفضل من سجود خفي -

'গোপন একাকীত্বে আল্লাহ্‌কে সেজদা করার চাইতে অধিক নৈকট্য দানকারী আর কোন ইবাদত নাই।'

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ 'যে কোন মুসলমান আল্লাহ্‌কে যখন সেজদা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তখন তার একটি দর্জা বুলন্দ করেন এবং একটি গুনাহ্ মাফ করেন।'

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করুন, যাতে আমি হাশরের ময়দানে আপনার শাফাআত লাভ করতে পারি এবং জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে পারি। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ

'এ ব্যাপারে তুমি আমাকে বেশী বেশী সেজদার (নামাযের) মাধ্যমে সহযোগিতা করতে থাক।'

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার অধিকতর নিকটতম হয় তখন, যখন সে সেজদায় থাকে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

واسجد واقترب ۩

"আপনি সেজদা করুন এবং আমার নৈকট্য লাভ করুন।"
(আলাক্ব ঃ ১৯)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

سيماهم في وجوههم من أثر السجود

"তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের মুখমণ্ডলে সেজদার চিহ্ন থাকবে।"
(ফাতহ্ ঃ ২৯)

এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী উক্ত চিহ্ন দ্বারা নামাযে খুশূ-খুযূর নূরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, আন্তরিক খুশূ-খুযূর প্রতিক্রিয়া বাহ্যিক অবয়বেও প্রকাশ পায়। অপর এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, উক্ত আয়াতে সেজদার সময় মাটিতে কপাল লাগানোর বিষয় বুঝানো হয়েছে। আরও এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী উক্ত আয়াতে সেই নূর ও ঔজ্জ্বল্যকে বুঝানো হয়েছে যা ক্বেয়ামতের দিন নামাযী ব্যক্তির চেহারায় তার উযূর কারণে প্রকাশ পাবে।

হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'পবিত্র কুরআনে সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করার পর আদম-সন্তান যখন সেজদা আদায় করে, তখন ইবলীস শয়তান অদূরে বসে কাঁদতে থাকে আর বলতে থাকে ঃ হায় আফ্‌সূস! আদম-সন্তানকে সেজদার হুকুম করা হয়েছে এবং তৎক্ষণাৎ সে তা পালন করেছে। আর আমাকে সেজদার হুকুম করা হয়েছিল, কিন্তু আমি তা পালন করতে অস্বীকার করেছি। তাই পরিণামে এখন আমার জন্য দোযখ ছাড়া আর কিছু নাই। হযরত আলী ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ 'ইবলীস প্রতিদিন এক হাজার

বার সেজদা করতো, ফলে তার উপাধি হয়েছিল 'সাজ্জাদ' অর্থাৎ অধিক সেজদাকারী।'

বর্ণিত আছে, হযরত উমর ইব্‌নে আব্দুল আযীয (রহঃ) সরাসরি মাটির উপর সেজদা করতেন।

ইউসূফ ইব্‌নে আস্‌বাত (রহঃ) বলেন ঃ "ওহে যুবকেরা! সুস্থ-সবল থাকতে অতি শীঘ্র কিছু করে নাও। বর্তমানে কেবল এক ব্যক্তিই এমন রয়েছেন, যাকে আমি ঈর্ষা করি ; তিনি পূর্ণাঙ্গরূপে রুকূ-সিজদাহ্ করেন। এখন দূরত্বের কারণে তাঁর সাথে আমার মোলাকাত হয় না।"

হযরত সাঈদ ইব্‌নে জুবায়ের (রহঃ) বলেন ঃ এ জগতের কোন বস্তু বা বিষয়ের জন্য আমার আদৌ কোন আফসূস হয় না ; কিন্তু কখনও যদি আমার একটি সেজদা কম হয়ে যায়, তখন আফসূসের কোন সীমা থাকে না।

হযরত উক্ববা ইব্‌নে মুসলিম (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ কামনা করার গুণটি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে খুবই প্রিয়। বান্দা আল্লাহ্‌র সর্বাধিক কাছাকাছি হয় তখন, যখন সে সেজদায় থাকে।'

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ 'সেজদার সময় বান্দা আল্লাহ্‌র নিকটতম সান্নিধ্যে পৌঁছে যায়। সুতরাং এ সময়টিতে অন্তর ভরে খুব দো'আ করে নেওয়া চাই।'

অধ্যায় ঃ ৪৯

বে-নামাযীর শাস্তি

আল্লাহ্ তা'আলা দোযখীদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ ۝ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۝ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۝ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ ۝

"কোন্ বস্তু তোমাদের দোযখে দাখেল করলো? তারা বলবে—আমরা না নামায পড়তাম, আর না দরিদ্রদের খানা খাওয়াতাম, আর (যারা সত্য ধর্মকে বিলুপ্ত করার চেষ্টায় রত ছিল সেই) প্রচেষ্টাকারীদের সাথে আমরাও চেষ্টা রত থাকতাম। (মুদ্দাস্‌সির ঃ ৪২-৪৫)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ اِلَّا تَرْكُ الصَّلٰوةِ

'বান্দা ও কুফ্‌রীর মধ্যে (যোগসেতু) হলো নামায ত্যাগ করা।' (অর্থাৎ নামায ত্যাগ করলে বান্দার কুফ্‌রীতে পতিত হতে বিলম্ব থাকে না)

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ আমাদের ও তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে যে অঙ্গীকার রয়েছে, তা হলো নামায। সুতরাং যে নামায ত্যাগ করবে, সে (প্রকাশ্যে) কাফের হয়ে যাবে।

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهَارًا

'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করলো, সে প্রকাশ্যে কুফ্‌রী করলো।'

হযরত উবাদাহ্ ইব্নে ছামেত (রাযিঃ) বলেন ঃ 'আমার প্রাণপ্রিয় দোস্ত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাকে সাতটি নছীহত করেছেন। তন্মধ্যে (চারটি এই)—এক, আল্লাহ্র সাথে কাউকে বা কোন কিছুকে শরীক করো না, এমনকি যদি তোমাকে কেটে টুক্রা টুক্রাও করে ফেলা হয় বা আগুনে নিক্ষেপ করা হয় বা শূলিতে চড়ানো হয়। দুই, স্বেচ্ছায় কখনও নামায ত্যাগ করো না। কারণ, এরূপ ব্যক্তি দ্বীন ও মিল্লাতের গণ্ডিবহির্ভূত হয়ে যায়। তিন, আল্লাহ্র না-ফরমানী ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ো না। কেননা, পাপকর্ম আল্লাহ্ তা'আলার রোষ ও অসন্তুষ্টির কারণ হয়। চার, মদ্যপান করো না। কারণ, মদ্যপান সর্ববিধ গুনাহের শিকড়।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ যাবতীয় আমলের মধ্যে একমাত্র নামায ব্যতীত অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফ্রী বলে মনে করতেন না।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ 'কুফ্র ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য হয় নামাযের দ্বারা ; সুতরাং যে নামায ত্যাগ করলো, সে শিরক করলো।'

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'যে নামায ত্যাগ করলো, ইসলামে তার কোন অংশ নাই। আর যার উযূ সঠিক নয়, তার নামাযও দুরুস্ত নয়।'

ত্বব্রানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যার আমানতদারী নাই, তার (পূর্ণ) ঈমান নাই। আর যার নামায নাই, তার দ্বীন বলতে কিছু নাই। বস্তুতঃ দ্বীনের জন্য নামাযের গুরুত্ব এমন, যেমন শরীরের জন্য মাথার গুরুত্ব।

হযরত আবুদ্দার্দা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নছীহত করেছেন ঃ আল্লাহ্র সাথে শরীক করো না, এমনকি যদি তোমাকে কেটে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেওয়া হয় বা আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বা শূলিতে চড়ানো হয়। ফরয নামায কখনও ত্যাগ করো না ; যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করবে, তার বিষয়ে আমার কোন দায়িত্ব থাকবে না। মদ্যপান করো না, কারণ, তা

সকল পাপাচারের মূল।'

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁর চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি যখন হ্রাস পেয়েছিল, তখন কেউ তাকে বলেছিল, আপনি কয়েকদিনের জন্য নামায থেকে বিরত থাকলে আমরা আপনার চিকিৎসা করে সেরে নিতাম। হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বললেন ঃ 'যে নামায ত্যাগ করবে, ক্বেয়ামতের দিন সে আল্লাহ্র সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার উপর খুবই রাগান্বিত থাকবেন।'

ত্বব্রানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন কিছু উপদেশ দান করুন, যে অনুযায়ী আমল করলে আমি বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারি। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ 'তোমাকে যদি কঠিন শাস্তিও দেওয়া হয় বা আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তবুও আল্লাহ্র সঙ্গে শির্ক করো না। পিতা-মাতার অবাধ্যতা করো না, এমনকি তারা যদি তোমাকে তোমার ধন-সম্পদ ও সর্বস্ব থেকে বঞ্চিতও করে দেয়, তবুও তাদের অবাধ্যতা থেকে বিরত থাক। আর স্বেচ্ছায় কখনও নামায ত্যাগ করো না। কারণ, নামায ত্যাগকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র অনুগ্রহদৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে যায়।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তোমাকে হত্যা করা হলে বা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলেও আল্লাহ্র সঙ্গে শির্ক করো না, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করো না ; তারা যদি তোমাকে তোমার ধন-সম্পদ ও স্ত্রী-পরিজন থেকে পৃথক হয়ে যেতে বলে, তবুও তাদের বাধ্য থাক। ফরয নামায স্বেচ্ছায় কখনও ত্যাগ করো না। কারণ, এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্র নিরাপত্তা হতে বঞ্চিত। শরাব পান করো না। কারণ, শরাব সর্ববিধ পাপের মূল। গুনাহ্ থেকে পরহেয কর, কেননা গুনাহ্ আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও রোষের কারণ হয়। জেহাদের ময়দান হতে পলায়ন করো না, এমনকি ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি দেখা দিলেও নয়। সাধারণভাবে মৃত্যু (মহামারী) দেখা দিলেও তুমি দৃঢ়পদ থাক। সামর্থ অনুযায়ী পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ কর, তাদের প্রতি শাসনের বেত্র উত্তোলিত রাখতে অবহেলা করো না, সদা আল্লাহ্র ভয় প্রদর্শন কর।'

ইব্‌নে হাব্বানে বর্ণিত হয়েছে, 'মেঘলা দিনে সঠিক সময়ে আগে-ভাগে নামায পড়। যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করলো, সে কুফ্‌রী করলো।'

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায ত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার নাম দোযখের দরজায় লিখে দিবেন, যা দিয়ে সে প্রবেশ করবে।

বায়হাক্বী শরীফে আছে, যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করলো, তার এরূপ ক্ষতি হলো, যেমন তার ধন-সম্পদ ও আত্মীয়-পরিজন ধ্বংস হয়ে গেল।

হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

وَاللهِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَتُقِيْمُنَّ الصَّلٰوةَ وَلَتُؤْتُنَّ الزَّكَاةَ اَوْ لَاَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلًا فَيَضْرِبُ اَعْنَاقَكُمْ عَلَى الدِّيْنِ۔

'ওহে কুরাইশবংশীয় লোকেরা! শুনে রাখ,—আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা অবশ্যই নামায পড়, যাকাত আদায় কর। তা-নাহলে তোমাদের উপর এমন লোককে জয়ী করে দেওয়া হবে, যে দ্বীনের জন্য তোমাদেরকে হত্যা করবে।'

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামে চারটি বিষয়কে অতি অবশ্য ও অপরিহার্য কর্তব্যরূপে ফরয করে দিয়েছেন ঃ নামায, যাকাত, রমযানের রোযা ও হজ্জে বাইতুল্লাহ ; যদি কেউ যে কোন একটিও পরিত্যাগ করে বাকী তিনটির উপর আমল করে, তবুও কোন কাজে আসবে না, যাবৎ সে সব কয়টি বিষয়ের উপর আমল না করবে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ হতে সকল তত্ত্বজ্ঞানী এ ব্যাপারে একমত যে, 'বিনা উযরে যদি কেউ নামায আদায় না করে সময় পার করে দেয়, তাহলে এরূপ ব্যক্তি কাফের।'

হযরত আইয়ূব (রহঃ) বলেন ঃ 'নামায ত্যাগ করা কুফ্‌র,—এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নাই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝ اِلَّا مَنْ تَابَ

"তাদের পর এমন না-লায়েক লোক জন্মালো, যারা নামায বিনষ্ট করে দিল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। সুতরাং তারা শীঘ্রই বিপদ দেখবে। অবশ্য যারা তওবা করছে।" (মারইয়াম ঃ ৫৯)

হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন ঃ 'উক্ত আয়াতে উল্লিখিত اضاعوا শব্দের অর্থ 'একেবারে নামায ত্যাগ করা নয় ; বরং এর অর্থ,—নামাযের নির্ধারিত সময় পার করে দেওয়া—এরূপ ব্যক্তিদের জন্য উপরোক্ত আয়াতে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যতম তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইব্‌নে মুসাইয়্যাব (রহঃ) বলেন ঃ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ অর্থ হচ্ছে, তারা নামাযের ব্যাপারে এতোই গাফেল যে, যোহরের সময় পার হয়ে আছরের সময় উপস্থিত হয়ে যায়, অনুরূপ আছর পার হয়ে মাগরিব, মাগরিব পার হয়ে ইশা, ইশা পার হয়ে ফজর—তবুও তারা নামাযের ব্যাপারে সচেতন হয় না। এহেন অবস্থা থেকে যদি তারা তওবা না করে, তবে তাদের জন্য উপরোক্ত আয়াতে غَيٌّ (জাহান্নামের একটি উপত্যকা)-এ পতিত হওয়ার ঘোষণা রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

"হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে তোমাদেরকে গাফেল করতে না পারে। আর যারা এরূপ করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (মুনাফিকূন ঃ ৯)

উক্ত আয়াতে ذكر দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যে সকল লোক পার্থিব ধন-সম্পদের মোহে পতিত হয়ে ক্রয়-বিক্রয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্যে বা পরিবার-পরিজনের মায়া-মমতার দরুন নামাযে

অবহেলা প্রদর্শন করবে, তারা নির্ঘাত ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

"অতএব বড় সর্বনাশ ঐ সকল নামাযীর জন্য যারা নিজেদের নামাযকে ভুলে থাকে।" (মাউন ঃ ৪,৫)

হযরত সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমি উক্ত আয়াতের মর্ম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছেন ঃ এরা হচ্ছে ওইসব লোক, যারা নির্ধারিত সময় পার করে নামায পড়ে।' হযরত মুসআব ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেনঃ 'উক্ত আয়াত সম্বন্ধে আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নামাযে ভুল-ভ্রান্তি বা এদিক-সেদিক চিন্তা করা থেকে তো আমরা কেউ মুক্ত নই? তিনি বললেন ঃ আয়াতের অর্থ এই নয়, বরং এ আয়াতে ওইসব লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা নামাযের নির্ধারিত সময় পার করে দেয়।' وَيْل দ্বারা কঠিন শাস্তি বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন ঃ وَيْل জাহান্নামের একটি উপত্যকা দুনিয়ার সমস্ত পাহাড়-পর্বতকে যদি একত্রিত করে তাতে নিক্ষেপ করা হয়, তবে সেই উপত্যকার তাপে বিগলিত হয়ে যাবে। নামাযের ব্যাপারে অবহেলাকারী এবং অসময়ে নামায পাঠকারীদের জন্য তা' হবে আবাসস্থল। অবশ্য যারা সত্যিকার তওবা-অনুতাপ করবে এবং উক্ত অবহেলা পরিহার করবে তারা নিস্কৃতি পাবে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ نَقَصَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ.

"ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার যে আমলের হিসাব হবে, তা হচ্ছে নামায। যদি নামায সঠিক হয়, তবে সে কৃতকার্য ও উত্তীর্ণ হবে। আর

যদি নামায ত্রুটিপূর্ণ হয়, তবে সে অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

ত্ববরানী ও ইবনে হাব্বানে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.

"যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে, ক্বেয়ামতের দিন সেই নামায তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তিস্বরূপ হবে। আর যে ব্যক্তি এর হেফাজত করবে না, তার জন্য তা জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তিস্বরূপ হবে না। সুতরাং ক্বিয়ামতের দিন সে কারূন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালাফের সাথে হবে।"

নামায ত্যাগকারী লোকদের হাশর উপরোক্ত ব্যক্তিদের সাথে এজন্যে হবে যে, যে ব্যক্তিকে ধন-সম্পদের মায়া-মোহ নামায থেকে বিরত রেখেছে, তার সামঞ্জস্য হয় কারূনের সাথে, তাই এরূপ লোকের হাশর হবে তারই সাথে। যে ব্যক্তিকে রাজত্বের মোহ নামায থেকে উদাসীন করে রেখেছে, তার সামঞ্জস্য হয় ফেরাউনের সাথে, তাই এরূপ লোকের হাশর হবে তারই সাথে। আর যে ব্যক্তিকে চাকরী-নকরী বা মন্ত্রীত্বের মোহ নামায থেকে গাফেল করে রেখেছে, তার সামঞ্জস্য হয় হামানের সাথে, তাই এরূপ লোকের হাশর হবে হামানেরই সাথে। অনুরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকার্যরত লোকদের সামঞ্জস্য উবাই-ইবনে খলফের সাথে, তাই তাদের হাশর হবে তারই সাথে।'

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি বিনা উযরে দুই ওয়াক্ত নামায (এক ওয়াক্তকে বিলম্বিত করে অপর ওয়াক্তের সাথে) একত্রিত করে পড়লো, সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলো।'

নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'নামাযসমূহের মধ্যে একটি নামায এমন রয়েছে, যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করলো, সে এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হলো, যেন তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল। সেটি আছরের নামায।'

অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, 'উক্ত আছরের নামায তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা এর হক রক্ষা করে নাই। এখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই নামাযের হেফাজত করবে, তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। এই নামাযের পর তারকা উদিত হওয়া (অর্থাৎ সন্ধ্যা) পর্যন্ত আর কোন নামায নাই।'

আহমদ, বুখারী ও নাসায়ী শরীফে বর্ণিত, যে ব্যক্তি আছরের নামায ত্যাগ করলো, তার আমল ধ্বংস হয়ে গেল।

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাযিঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের কেউ কি কোন স্বপ্ন দেখেছ? কেউ কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে তাঁর নিকট বলতেন, যা আল্লাহ্ চাইতেন। একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'রাতে আমার নিকট দু'জন আগন্তুক (ফেরেশ্তা) আসলো। তারা আমাকে জাগিয়ে উদ্বুদ্ধ করে বললো, চলুন! আমি তাদের সাথে চললাম। এভাবে আমরা একজন লোকের নিকট পৌঁছলাম, সে কাত হয়ে শুয়েছিল। অপর একজন তার নিকট পাথর হাতে দাঁড়ান। সে তার মাথা লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করছে, এতে তার মাথা ফেটে যাচ্ছে, আর পাথর অনেক নীচে গিয়ে পড়ছে। সে আবার পাথরের পিছনে পিছনে গিয়ে পাথরটি নিয়ে আসতে না আসতেই তার মাথা পূর্বের ন্যায় ভাল হয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে সে পুনরায় পূর্বের ন্যায় আচরণ করছে। আমি ফেরেশ্তাদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, সুবহানাল্লাহ্! বলুন, এরা কারা? তারা বললেন, সামনে চলুন। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে অপর একজনকে পেলাম, যে চিৎ হয়ে শুয়েছিল। আরেকজন তার নিকট লোহার সাঁড়াশী হাতে দাঁড়ান ছিল। সে এই সাঁড়াশী দ্বারা একের পর এক তার মুখমণ্ডলের একাংশ চিরে গলার পিছন পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। অনুরূপ তার নাসাভ্যন্তর ও চোখ চিরে পিছন পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। বর্ণনাকারী

বলেন, আবূ রাজা বেশীর ভাগ সময় এরূপ বলতেন, সে একদিকে কেটে অপর দিকে কাটতো। অপর দিকে কাটা শেষ হতে না হতেই প্রথম দিকটা পূর্বের ন্যায় ভাল হয়ে যেত, এভাবে বারবার এরূপই করতো যেরূপ প্রথম করেছিল। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্! বলুন, এরা দুজন কে? তারা বললেন, সামনে চলুন। সামনে আমরা একটি চুলার নিকট গিয়ে পৌঁছলাম। তিনি বললেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, আমি সেখানে শোরগোলের শব্দ শুনতে পেলাম, যাদের নীচ থেকে আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছিল। আগুনের আওতায় আসলেই তারা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে উঠতো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তাঁরা বললেন, সামনে চলুন। সামনে অগ্রসর হয়ে আমরা একটি নহরের নিকট পৌঁছলাম। আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন, সেটি ছিল রক্তের লাল নহর। নহরে একজনকে সাতরাতে দেখলাম। নহরের পাড়ে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, যার নিকট ছিল অসংখ্য পাথরের স্তূপ। সাতারকারী লোকটি সাতরানো শেষ করে দাঁড়ানো লোকটির নিকট এসে মুখ খুলে দিতো। আর সে তার মুখে একটি পাথর নিক্ষেপ করতো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তাঁরা বললেন, সামনে চলুন। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে একজন বীভৎস চেহারার লোক দেখতে পেলাম, যেরূপ তোমরা কোন বীভৎস চেহারার লোক দেখে থাক। তার নিকট ছিল আগুন। সে আগুন জ্বালাচ্ছিল আর তার চতুর্দিকে দৌড়াচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোক কে? তারা বললেন, সামনে চলুন। সামনে আমরা এক ঘন সন্নিবিষ্ট বাগানে উপনীত হলাম। বাগানটি বসন্তের রকমারি ফুলে সুশোভিত ছিল। বাগানের মাঝে ছিল একজন লোক। যার আকৃতি এতখানি দীর্ঘকায় ছিল যে, আমরা তার মাথা দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাঁর চারপাশে এত বিপুলসংখ্যক বালক ছিল, যেরূপ আর কখনও আমি দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোক কে? আর এরাই বা কারা? তারা বললেন, সামনে চলুন, সামনে চলুন। অবশেষে আমরা এক বিরাট বাগানে গিয়ে উপনীত হলাম। এরূপ বড় ও সুন্দর বাগান আমি আর কখনও দেখি নাই। তাঁরা আমাকে বললেন, এর উপর আরোহণ করুন। আমরা তাতে আরোহণ করলে একটি শহর আমাদের নজরে পড়লো। সেটি ছিল সোনা ও রূপার ইট দিয়ে তৈরী। আমরা ওই শহরের দরজায় পৌঁছলাম। দরজা খুলতে বললে

আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হলো। ভিতরে প্রবেশ করে আমরা কিছু লোকের সাক্ষাৎ পেলাম। যাদের শরীরের অর্ধেক খুবই সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল। যেরূপ তোমরা খুব সুন্দর কাউকে দেখে থাক। আর অর্ধেক ছিল খুবই কদাকার। যেরূপ তোমরা খুব কদাকার কাউকে দেখে থাক। তারা উভয়ে ঐ লোকদের উদ্দেশ্যে বললো যাও, তোমরা এ ঝর্ণায় নেমে পড়। দেখা গেল প্রস্থের দিকে লম্বা প্রবহমান একটি ঝর্ণা রয়েছে। তার পানি ছিল সম্পূর্ণ সাদা। তারা গিয়ে ঝর্ণায় নেমে পড়লো। তারপর তারা আমাদের নিকট আসলো। দেখা গেল তাদের কদাকৃতি দূর হয়ে গেছে। এখন তারা খুব সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে গেছে। ফেরেশ্‌তাদ্বয় আমাকে জানালেন, "এটাই 'আদ্‌ন' নামক বেহেশ্‌ত, এটাই আপনার বাসস্থান। আমি উপরের দিকে তাকালাম, দেখলাম— ধবধবে সাদা মেঘের ন্যায় এক অট্টালিকা। তাঁরা আমাকে জানালেন, 'এটাই আপনার প্রাসাদ।' আমি বললাম, 'আল্লাহ্‌ আপনাদের উভয়ের কল্যাণ করুন, আমাকে ছেড়ে দিন আমি এতে প্রবেশ করবো। তাঁরা বললেন, এখন নয়, তবে এতে আপনি অবশ্যই প্রবেশ করবেন। আমি তাদের বললাম, সারা রাত্র ধরে আমি অনেক অনেক আশ্চর্য জিনিস প্রত্যক্ষ করলাম, এগুলোর তাৎপর্য কি? তারা উভয়ে বললেন, এখন আমরা তা আপনাকে জানাবো। প্রথম যে ব্যক্তির নিকট আপনি গিয়েছেন, যার মাথা পাথর মেরে মেরে চৌচির করা হচ্ছিল, সে কুরআন মুখস্থ করে (তার উপর আমল) ছেড়ে দিতো, আর ঘুমিয়ে ফরজ নামায ত্যাগ করতো। আর যে ব্যক্তির নিকট আপনি গেলেন, যার গলদেশের পিছন পর্যন্ত চেরা হচ্ছিল, আর নাসাভ্যন্তর ও তার চোখ পিঠ পর্যন্ত চেরা হচ্ছিল, সে সকাল বেলা আপন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতো আর চতুর্দিকে মিথ্যার বেসাতি করে বেড়াতো। আর ঐ উলঙ্গ নারী-পুরুষ যাদেরকে প্রজ্জ্বলিত চুলায় দেখেছেন, তারা ছিল যেনাকার পুরুষ ও যেনাকার নারী। আর যে লোক ঝর্ণায় সাঁতরাচ্ছিল, যার নিকট দিয়ে আপনি গিয়েছিলেন, যে পাথরের লোকমা খাচ্ছিল, সে ছিল সুদখোর। আর ঐ কদাকার ব্যক্তি যাকে আপনি আগুনের নিকট দেখেছিলেন আর যে আগুন জ্বালিয়ে তার চার দিকে দৌড়াচ্ছিল, সে দোযখের দারোগা মালেক ফেরেশ্‌তা। বাগানে যে দীর্ঘাকৃতির লোককে দেখেছেন, তিনি ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌ সালাম। আর তাঁর চারপাশে যে বালকদেরকে দেখেছেন,

তারা ছিল ঐসব শিশু যারা স্বভাবধর্মের (ইসলাম) উপর মৃত্যুবরণ করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, মুসলমানদের কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মুশরিকদের সন্তানরা কোথায়? তিনি বলেছেন, তারাও সেখানে ছিল। আর যাদের অধিক অংশ অত্যন্ত সুন্দর ছিল আরেক অংশ ছিল অত্যন্ত কদাকার, তারা ছিল ঐসব লোক, যারা ভাল-মন্দ উভয় কাজ মিশ্রিতভাবে করেছিল। আল্লাহ্‌ তাদের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

বায্‌যার সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে, অতঃপর হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু লোকের পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, যাদের মাথায় প্রস্তরাঘাত করা হচ্ছে। পাথরের আঘাতে মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং নিক্ষিপ্ত পাথরগুলো ছিটকিয়ে দূরে গিয়ে পড়ছে। আঘাতকারী পাথর তুলে আনার সময়টিতে ঐ চূর্ণ-বিচূর্ণ মাথা পুনরায় ঠিক হয়ে যাচ্ছে এবং পুনরায় ঐ পাথর দিয়ে তাদের মাথায় আঘাত করা হচ্ছে—এভাবে বার বার করা হচ্ছে। হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এরা কারা? তাদের অপরাধই বা কি? জিব্‌রাঈল বললেন ঃ এরা দুনিয়াতে নামায পরিত্যাগ করেছে ; এ দায়িত্বের বোঝায় তাদের মাথা ভার হয়ে রয়েছে।'

খতীব ও ইব্‌নে নাজ্জার রেওয়ায়াত করেছেন, 'নামায ইসলামের পতাকা বা উজ্জ্বল প্রতীক। এই নামাযের জন্য যে ব্যক্তি নিজের অন্তরকে ফারেগ করে নিবে এবং নির্ধারিত সময় ও সুন্নত মুতাবেক আদায় করবে, (তার সম্পর্কে বলা যায়) সে মুমিন।'

ইব্‌নে মাজাহ্‌ শরীফে বর্ণিত, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ

اِفْتَرَضْتُ عَلٰى اُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوٰتٍ وَّعَهِدْتُ عِنْدِىْ عَهْدًا اَنَّ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهٗ عِنْدِىْ

'আমি তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি এবং আমি এই অঙ্গীকার নিয়েছি, যে ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, আমি তাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাবো। পক্ষান্তরে,

যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করবে না, তার নিরাপত্তা সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্ব নাই।'

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি নামাযের ফরযিয়ত ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে পরিপক্ক একীন সহকারে তা আদায় করবে, সে বেহেশ্ত লাভ করবে।'

অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ لِمَلَائِكَتِهِ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمِّلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذٰلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلٰى حَسَبِ ذٰلِكَ.

'ক্বেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার যে আমলের হিসাব নেওয়া হবে, তা হবে নামায। যদি তা সঠিক পাওয়া যায়, তাহলে সে সফলকাম হবে এবং নিজ লক্ষ্যে পৌঁছবে। আর যদি নামাযে গলদ থাকে, তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি তার ফরযগুলোর মধ্যে কোন কম্‌তি থাকে, তবে মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, দেখ, আমার বান্দার কিছু নফলও আছে কিনা? এর সাহায্যে তার ফরযগুলোর কম্‌তি পূরণ করে দাও। তারপর সমস্ত আমলের হিসাব এভাবেই পূরণ করা হবে।'

ত্বব্‌রানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

أَوَّلُ مَا يُسْئَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْظَرُ فِي صَلَاتِهِ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ.

'ক্বেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দাকে যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, তা হবে নামায। নামাযের হিসাব-নিকাশে যদি তাকে সঠিক পাওয়া যায়, তবে

সে কামিয়াব। আর যদি নামাযের বিষয়ে কোন গলদ থাকে, তবে সে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।'

ত্বায়ালিসী ও ত্বব্‌রানী বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'একদা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস্ সালাম আমার নিকট এসে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমি তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে সঠিক সময়ে নামায আদায় করবে এবং রুকূ সেজদা পূর্ণভাবে আদায় করবে, তার জন্য আমার নিকট প্রতিশ্রুতি রয়েছে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে ব্যক্তি তা করবে না, তার জন্য আমার নিকট কোন প্রতিশ্রুতি নাই। ইচ্ছা করলে আমি তাকে শাস্তিও দিতে পারি আর ইচ্ছা করলে মা'ফও করতে পারি।'

বায়হাক্বী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'নামাযের একটি মীযান (পাল্লা) আছে, যে ব্যক্তি (সঠিকভাবে নামায পড়ে) তা' পূর্ণ করবে, সে পরিপূর্ণ সওয়াব পাবে।'

দীলামী রেওয়ায়াত করেন, 'নামায শয়তানের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ করে দেয়, দান-খয়রাত তার পৃষ্ঠ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, একমাত্র আল্লাহ্‌র নিমিত্ত ও ইল্‌মের খাতিরে কাউকে মহব্বত করা শয়তানের মূলোৎপাটন করে দেয়, এতদ্বারা শয়তান তোমাদের থেকে এত দূরত্বে সরে যায়, যত দূরত্ব রয়েছে পূর্ব প্রান্ত ও পশ্চিম প্রান্তের মাঝে।'

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَادُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَوِي أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ.

'আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়, তোমাদের (রমযান) মাসটির রোযা রাখ, তোমাদের মালের যাকাত দাও, তোমাদের কর্মকর্তার অনুগত থাক, তাহলে তোমরা তোমাদের রব্বের বেহেশ্‌তে প্রবেশ লাভ করবে।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল হচ্ছে সঠিক সময়ের নামায, তারপর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার, তারপর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ।'

বায়হাক্বী শরীফে বর্ণিত, হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দ্বীন ইসলামের কোন্ আমলটি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়? তিনি বললেন ঃ 'সঠিক ওয়াক্তে নামায পড়া ; যে ব্যক্তি নামায তরক করলো, তার দ্বীন বলতে কিছু রইল না, বস্তুতঃ নামায দ্বীনের স্তম্ভ।' বর্ণিত আছে, নামাযের উক্তরূপ গুরুত্বের কারণেই হযরত উমর (রাযিঃ)কে তাঁর অন্তিমকালীন মারাত্মক যখমীর (আহত) সময় যখন নামাযের কথা বলা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, অবশ্যই নামাযকে কোন অবস্থায়ই নষ্ট হতে দেওয়া যায় না ; কেননা, যার নামায নাই, তার মধ্যে দ্বীন-ইসলামের কোন অংশ নাই। তাই, হযরত উমর (রাযিঃ) এমন অবস্থায় নামায পড়ছিলেন, যখন তাঁর দেহ থেকে রক্ত ঝরছিল।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়ে, তার নামায নূরানী হয়ে আরশ পর্যন্ত আরোহণ করে এবং নামাযীর জন্য সে এই বলে দো'আ করতে থাকে যে, তুমি যেরূপ যত্নের সাথে আমাকে সম্পন্ন করেছ, আল্লাহ্ তোমাকে তদ্রূপ যত্ন ও সস্নেহে রক্ষণাবেক্ষণ করুন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ঠিকমত নামায আদায় করে না, তার নামায কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে উর্ধ্বগগনে উত্থিত হয় এবং উক্ত নামাযকে পুরাতন ছেঁড়া কাপড়ের ন্যায় পুটুলী বেঁধে সেই নামাযীর মুখের উপর নিক্ষেপ করা হয়।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'তিন শ্রেনীর লোকের নামায আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেন না। তন্মধ্যে এক শ্রেনীর লোক তারা, যারা সময় পার হয়ে যাওয়ার পর নামায পড়ে।'

কোন কোন আলেম বলেছেন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَاةِ أَكْرَمَهُ اللّٰهُ بِخَمْسِ خِصَالٍ يَرْفَعُ عَنْهُ ضَيْقَ الْعَيْشِ وَعَذَابَ الْقَبْرِ وَيُعْطِيهِ اللّٰهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

'যে ব্যক্তি যাবতীয় শর্তসহ যথারীতি নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পাঁচটি পুরস্কারে ভূষিত করবেন। যথা ঃ- এক, রিযিকের অভাব দূর করে দিবেন। **দুই**, কবরের আযাব থেকে মুক্ত রাখবেন। তিন, আমলনামা ডান হাতে দিবেন। **চার**, বিদ্যুৎগতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। **পাঁচ**, বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে।'

আর যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে গাফলতি ও অবহেলা করবে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা পনেরটি শাস্তি দিবেন ; পাঁচটি দুনিয়াতে, তিনটি মৃত্যুর সময়, তিনটি কবরে এবং তিনটি কবর থেকে বের হওয়ার পর হাশরের ময়দানে।

দুনিয়াতে পাঁচটি শাস্তি, যথা ঃ- **এক**, তার সময় ও জীবিকায় বরকত থাকবে না। **দুই**, তার চেহারায় নেক লোকের চিহ্ন থাকবে না। তিন, যে কোন নেক আমল সে করবে আল্লাহ্‌র নিকট তার কোন সওয়াব পাবে না। **চার**, তার কোন দো'আ কবূল হবে না। **পাঁচ**, নেক লোকদের কোন দো'আও তার পক্ষে কবূল হবে না।

মৃত্যুকালীন তিনটি শাস্তি, যথা ঃ- এক, অপমৃত্যু ঘটবে। **দুই**, অভুক্ত অবস্থায় মারা যাবে। **তিন**, পিপাসার্ত অবস্থায় মৃত্যু হবে ; তখন এত বেশী পিপাসা হবে যে, কয়েক সাগরের পানি পান করালেও তার পিপাসা মিটবে না।

কবরের তিনটি শাস্তি, যথা ঃ- **এক**, বেনামাযীর কবর এত সংকীর্ণ হবে যে, তার শরীরের দু'দিকের পাঁজর একে অপরের ভিতর ঢুকে যাবে। **দুই**, কবর অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হবে এবং দিবা-রাত্রি সে তাতে প্রজ্জ্বলিত হতে থাকবে। **তিন**, বেনামাযীর কবরে 'সুজা আক্বরা' নামক এক ভয়ংকর সাপ তার উপর নিয়োগ করা হবে। তার চোখ দুটি হবে আগুনের এবং

নখরগুলো হবে লোহার। প্রতিটি নখ এক দিনের পথ অর্থাৎ বার ক্রোশ দূরত্ব পরিমাণ লম্বা হবে। সাপটি মৃত ব্যক্তির সাথে কথা–বার্তা বলবে ; নিজকে 'সুজা আক্করা' বলে পরিচয় দিবে। তার আওয়ায হবে বজ্রের ন্যায় কঠিন। সে বলবে, তোমাকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার জন্যই আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। আমি তোমাকে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকব ; ফজরের নামায ত্যাগ করার দরুন যোহর পর্যন্ত, যোহরের নামায ত্যাগ করার দরুন আছর পর্যন্ত, আছরের নামায ত্যাগ করার দরুন মাগরিব পর্যন্ত, মাগরিবের নামায ত্যাগ করার দরুন ইশা পর্যন্ত এবং ইশার নামায ত্যাগ করার দরুন ফজর পর্যন্ত। এভাবে আমি তোমাকে উপর্যুপরি আঘাত হানতেই থাকবো। এই বিষাক্ত অজগরের আঘাত এতই মারাত্মক হবে যে, প্রতি আঘাতে বেনামাযী সত্তর গজ মাটির নীচে ধ্বসে যাবে। এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত বেনামাযীর শাস্তি হতে থাকবে।

কেয়ামতের দিন হাশরে তিনটি শাস্তি, যথা ঃ এক, অত্যন্ত কঠিনভাবে বেনামাযীর হিসাব নেওয়া হবে। দুই, বেনামাযীর উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধে নিপতিত হবে। তিন, বহু অপমান করে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অপর এক সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে, কেয়ামতের ময়দানে বেনামাযীর মুখমণ্ডলে নিম্নোক্ত তিনটি বাক্য লিখা থাকবে, যথা ঃ—এক, 'ওহে আল্লাহ্‌র হক ধ্বংসকারী। দুই, 'ওহে আল্লাহ্‌র ক্রোধে নিপতিত!' তিন, তুমি যে আল্লাহ্‌র হক নষ্ট করেছ, আজকে সেরূপ আল্লাহ্‌র দয়া ও রহমত থেকে বঞ্চিত থাক।

উপরোক্ত হাদীসের সূচনাতে যে পনের সংখ্যার কথা বলা হয়েছিল, তা পূর্ণ না হয়ে চৌদ্দটি পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে ; হয়ত বর্ণনাকারী (রাভী) একটি সংখ্যা বিস্মৃত হয়ে গেছেন।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, 'কেয়ামতের ময়দানে একজন লোককে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার হুকুম করবেন। লোকটি বলবে, হে রব্ব! কেন আমার জন্য এই হুকুম। আল্লাহ্ বলবেন ঃ নামাযের বেলায় তুমি নির্ধারিত সময় পার করে দিয়েছ এবং দুনিয়াতে তুমি মিথ্যা কসমে অভ্যস্থ ছিলে।'

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমরা আল্লাহ্ পাকের দরবারে এই মর্মে দো'আ কর ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تَدَعْ فِيْنَا شَقِيًّا وَلَا مَحْرُوْمًا۔

'আয় আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে কাউকে হতভাগা ও বঞ্চিত করো না।'

আল্লাহ্‌র রাসূল নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান, হতভাগা ও বঞ্চিত কে? সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলে হুযূর বললেন ঃ

تَارِكُ الصَّلٰوةِ مَحْرُوْمٌ وَشَقِيٌّ۔

'নামায ত্যাগকারী ব্যক্তিই হতভাগা ও বঞ্চিত।'

আরও বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বেনামাযী লোকদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করবে। দোযখে 'লামলাম' নামক একটি উপত্যকা আছে। সেখানে অসংখ্য সাপ রয়েছে। প্রত্যেকটি সাপ উটের ঘাড়ের ন্যায় মোটা এবং এক মাসের দূরত্ব পরিমাণ লম্বা হবে। এগুলো বেনামাযী লোকদেরকে দংশন করতে থাকবে, যার বিষ সত্তর বছর পর্যন্ত উথ্‌লে উঠতে থাকবে। ফলে, তাদের দেহ বিবর্ণ হয়ে যাবে।

বনী ইসরাঈলের একজন মহিলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, হে মূসা! আমি একটি বড় গুনাহের কাজ করেছি এবং আল্লাহ্‌র কাছে তওবাও করেছি, আপনি যদি আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করে দেন, তাহলে অবশ্যই আমার তওবা কবুল হবে। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এমন কি গুনাহের কাজ করেছ, যদ্দরুন এত ভীত হয়ে পড়েছো? সে উত্তর করলো, আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি এবং প্রসূত সন্তানকে হত্যাও করে ফেলেছি। হযরত মূসা (আঃ) মহিলাটির কথা শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, দূর হও এখান থেকে না জানি আসমান থেকে অগ্নি বর্ষিত হয় এবং তোমার সাথে আমরাও ভস্ম হয়ে যাই। এ কথা শুনে মহিলাটি মনক্ষুন্ন হয়ে সেখান থেকে চলে গেল। অতঃপর হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) অবতরণ করে বললেন ঃ

'হে মূসা, আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, আপনি তওবাকারীনি মহিলাটিকে কেন ফিরিয়ে দিলেন? আমি কি তার চেয়েও বড় অপরাধী কে, তা বলবো? হযরত মূসা (আঃ) জানতে চাইলে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন ঃ 'তার চেয়েও বড় অপরাধী ঐ ব্যক্তি যে জেনে শুনে স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগ করে।'

জনৈক বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত, তাঁর ভগ্নির মৃত্যুর পর যথারীতি তার দাফনকার্য সম্পন্ন করলেন। কিন্তু দাফনের পর ভাইয়ের মনে পড়লো, ভুলবশতঃ টাকার একটি থলিও মাটিতে দাফন করা হয়ে গেছে। থলিটি আনার জন্য লোকজন বিদায় হওয়ার পর পুনরায় কবর খুললেন। কিন্তু তখন তিনি প্রত্যক্ষ করলেন যে, কবরের ভিতর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। তৎক্ষণাৎ তিনি মাটি দিয়ে কবর আচ্ছাদিত করে দিলেন। ফিরে এসে মাকে ভগ্নির কবরের অবস্থা বর্ণনা করে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে মা কেঁদে ফেললেন এবং বললেন,—তোমার বোন নামাযের ব্যাপারে অবহেলা করতো এবং সময় পার করে নামায পড়তো—এ হলো তার অবস্থা যে বিলম্ব করে হলেও নামায পড়তো। এ থেকেই উপলব্ধি করে নেওয়া চাই, যে মোটেই নামায পড়ে না, তার কি দশা হবে! আর আল্লাহ্ আমাদেরকে নামাযের যাবতীয় শর্ত ও হক আদায় করে যত্ন সহকারে তা আদায় করার তওফীক দান করুন, আপনি অনন্ত মেহেরবান ও দয়াশীল।

অধ্যায় ঃ ৫০

দোযখ ও দোযখের ভয়াবহ শাস্তির বয়ান

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ

"যার (জাহান্নামের) সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেকটি দরজার (মধ্য দিয়ে যাওয়ার) জন্য তাদের পৃথক পৃথক ভাগ রয়েছে।" (হিজ্‌র ঃ ৪৪)

আয়াতে উল্লেখিত 'জুয্' শব্দ দ্বারা বিভিন্ন গ্রুপ ও দল বুঝানো হয়েছে। এক উক্তি অনুযায়ী 'আব্ওয়াব' দ্বারা স্তর অর্থাৎ উপরের ও নীচের স্তরসমূহ বুঝানো হয়েছে।

ইব্নে জুরাইজ (রহঃ) বলেন, দোযখের সাতটি (দার্‌ক) অধঃগামী স্তর রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে— জাহান্নাম, লাযা, হুতামাহ্, সায়ীর, সাকার, জাহীম ও হাবিয়াহ্। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম স্তরটি তওহীদে বিশ্বাসী গুনাহ্গারদের জন্য, দ্বিতীয়টি ইহুদীদের জন্য, তৃতীয়টি নাসারাদের জন্য, চতুর্থটি সাবেয়ীন সম্প্রদায়ের জন্য, পঞ্চমটি মজূসী অর্থাৎ অগ্নিপূজকদের জন্য, ষষ্ঠটি মুশ্‌রিকদের জন্য এবং সপ্তমটি মুনাফিকদের জন্য। এগুলোর মধ্যে 'জাহান্নাম' হলো সর্বোচ্চ স্তর। অতঃপর অন্যান্য স্তরের অবস্থান। বিষয়টির ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসের অনুসারী সাত শ্রেণীর লোকদের শাস্তি প্রদান করবেন। এক এক শ্রেণীর লোককে দোযখের এক এক স্তরে নিক্ষেপ করবেন। এর কারণ হচ্ছে, কুফ্‌র ও আল্লাহ্‌র না-ফরমানীরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং তা দোযখের স্তরের মতই বিভিন্ন। এক অভিমত অনুযায়ী এসব স্তর সাত অঙ্গ অর্থাৎ চক্ষু, কান, জিহ্বা, পেট, লজ্জাস্থান, হাত, পা অনুযায়ী রাখা হয়েছে। এসব অঙ্গের মাধ্যমেই যেহেতু অন্যায়-অপরাধ করা হয়, তাই দোযখের প্রবেশদ্বারও সাতটি নির্মিত হয়েছে।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, দোযখের উপরে-নীচে সাতটি স্তর রয়েছে, প্রথম স্তরটি পূর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয়টি পূর্ণ করা হবে, অতঃপর তৃতীয়টি- এভাবে সবগুলো স্তরই পাপী-অপরাধীদের দ্বারা পূর্ণ করা হবে।

তারীখে বুখারী ও সুনানে তিরমিযী কিতাবে হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে, তন্মধ্যে একটি দরজা ঐ সব লোকের জন্য যারা আমার উম্মতের উপর তলোয়ার উঠিয়েছে।"

'ত্ববরানী আওসাত' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস্ সালাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন সময় উপস্থিত হয়েছেন, যে সময় তিনি কখনও উপস্থিত হোন না। নবীজী তৎপর হয়ে অগ্রসর হলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিব্‌রাঈল! আপনার কি হয়েছে ; এমন বিবর্ণ দেখা যাচ্ছে কেন আপনাকে? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা দোযখাগ্নি উত্তপ্ত করার হুকুম দিয়েছেন ; তারপরেই এসে আপনার কাছে হাজির হলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে কিছু বিবরণ শোনান। হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস্ সালাম বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা দোযখকে উত্তপ্ত হওয়ার জন্য হুকুম করলেন। অতঃপর সে এক হাজার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত হতে থাকে। ফলে দোযখের আগুন শ্বেত বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর আবার হুকুম করেন। এবারও এক হাজার বছর জ্বলতে থাকে, ফলে দোযখের আগুন লাল বর্ণে রূপান্তরিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় দোযখকে আরও উত্তপ্ত হওয়ার জন্য হুকুম করেন। অতএব দোযখের আগুন আরও এক হাজার বছর জ্বলতে থাকে। পরিশেষে এ আগুন কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে। বর্তমানে সেই আগুনের অবস্থা এই যে, এর স্ফুলিঙ্গের কোন শেষ নাই এবং এর লেলিহানেরও কোন অবধি নাই। ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন—একটি সুইয়ের পরিমাণ অংশও যদি দোযখের ফুটা হয়ে যায়, তাহলে জগতের সমস্ত মানুষ এর আতংকে মরে যাবে। ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন, দোযখের প্রহরীদের মধ্য হতে যদি একজনও দুনিয়াবাসীর সামনে প্রকাশ পায়, তবে সমগ্র দুনিয়াবাসী তার ভয়ে মৃত্যুবরণ

করবে। ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন- দোযখের শিকলসমূহের মধ্য হতে এমন একটি শিকল যার উল্লেখ পবিত্র কুরআনে করা হয়েছে, যদি দুনিয়ার পাহাড়-পর্বতের উপর রাখা হয়, তবে পাহাড়সমূহ বিগলিত হয়ে যাবে এবং শিকলটি যমীনের সর্বশেষ অংশে গিয়ে থেমে যাবে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে জিব্‌রাঈল, ক্ষান্ত হও, আর বলো না ; মনে হচ্ছে যেন আমার অন্তর ফেটে যাবে আর আমি এখনই মৃত্যুবরণ করবো। এ কথা বলে নবীজী হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-এর প্রতি তাকিয়ে দেখলেন—তিনি কাঁদছেন। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তো আপনার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। জিব্‌রাঈল (আঃ) আরজ করলেন, আমি কেন কাঁদবো না, আমার তো আরও বেশী পরিমাণে কাঁদা উচিত। কেননা, আল্লাহ্‌র কাছে যদি আমার বর্তমান অবস্থার স্থলে অন্য কোন অবস্থা হয়ে থাকে, তবে আমার কি উপায় হবে! আমি জানিনা, ইবলীসের উপর যেভাবে বিপদ এসেছে, সেরূপ আমার উপরও এসে পতিত না হয়, অথচ সেও ফেরেশ্‌তা ছিল। জানিনা, হারূত ও মারূতের উপর যেভাবে আপদ এসেছে, আমার উপরও সেরূপ এসে না পড়ে।

বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদতে লাগলেন, হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-ও কাঁদলেন। এভাবে উভয়ই কাঁদতে থাকলেন। এমন সময় গায়েব থেকে আওয়াজ আসলো, হে জিব্‌রাঈল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের উভয়কে তার না-ফরমানী ও অবাধ্যতা থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ করে দিয়েছেন। অতঃপর হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) উর্ধ্বজগতে চলে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ থেকে বাইরে তশরীফ আনলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন কয়েকজন আনসারী সাহাবী ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত রয়েছেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে নবীজী বললেন, তোমরা হাসি-ঠাট্টা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মগ্ন রয়েছ, অথচ তোমাদের মাথার উপর রয়েছে জাহান্নাম, আমি যা জেনেছি তোমরা যদি তা জানতে, তবে খুবই কম হাসতে এবং অতি অধিক মাত্রায় ক্রন্দন করতে, খাওয়া-দাওয়া তোমাদের কাছে ভাল লাগতো না এবং নির্জন ও উজাড় জঙ্গলে আল্লাহ্‌র তালাশে তোমরা বের হয়ে যেতে। এমন সময় অদৃশ্য থেকে

আওয়াজ আসলো, হে মুহাম্মদ! আমার বান্দাদেরকে নিরাশ করো না, তোমাকে সুসংবাদ প্রদানকারীরূপে পাঠিয়েছি ; হতাশ করার জন্যে নয়। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সকলে দুরুস্ত ও সঠিক পথের পথিক হয়ে যাও ; হক ও সত্য থেকে দূরে সরে যেও না।"

ইমাম আহমদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছেন, হযরত মীকাঈল (আঃ)-কে কখনও হাসতে দেখি নাই—এর কারণ কি? তিনি বললেন, যখন থেকে দোযখ বানানো হয়েছে তখন থেকে হযরত মীকাঈল (আঃ)-এর হাসি বন্ধ হয়ে গেছে।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন দোযখকে উপস্থিত করা হবে ; এর সত্তর হাজার লাগাম হবে এবং এক একটি লাগামে সত্তর হাজার করে ফেরেশ্‌তা দোযখকে টেনে হেঁচড়িয়ে নিয়ে আসবে।

অধ্যায় ঃ ৫১

দোযখ-আযাবের বিভিন্ন প্রকার

আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে— ইমাম তিরমিযী রেওয়ায়াতটিকে সহীহ্ বলেছেন—আল্লাহ্ তা'আলা যখন জান্নাত ও জাহান্নামকে সৃষ্টি করলেন, তখন হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে জান্নাতে পাঠালেন এবং বললেন, তুমি জান্নাতকে দেখ এবং জান্নাতের মধ্যে আমি যা কিছু রেখেছি, সেগুলোর প্রতিও দৃষ্টিপাত করো। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) জান্নাতে গেলেন এবং জান্নাত ও তৎসঙ্গে জান্নাতীদের জন্য সৃষ্ট নেয়ামতরাজি দেখে ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহ্, আপনার অনন্ত ইয্‌যত ও সম্মানের কসম, জান্নাত এবং জান্নাতের আরাম ও নেয়ামতের বিষয় যে-ই শুনতে পাবে, সে তাতে প্রবেশ করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতকে কষ্ট-ক্লিষ্ট ও সাধনার দ্বারা ঢেকে দিলেন (অর্থাৎ-জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে কষ্ট-ক্লিষ্ট ও সাধনা করতে হবে)। এরপর পুনরায় হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে জান্নাতে পাঠালেন। তিনি দেখে এসে বললেন, হে আল্লাহ্, আপনার ইয্‌যত ও প্রতাপের কসম, জান্নাতকে কষ্ট-সাধনা ও অপছন্দনীয় বিষয়ের দ্বারা এমনভাবে ঢেকে দেওয়া হয়েছে যে, আমার আশংকা হয়— জান্নাতে কেউ প্রবেশ লাভ করতে পারবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে জাহান্নামের দিকে পাঠিয়ে বললেন, দেখ, জাহান্নামবাসীদের জন্য আমি কি কি (শাস্তি) প্রস্তুত করে রেখেছি। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) গিয়ে দেখলেন, প্রচণ্ড শাস্তি, কেবল শাস্তি আর শাস্তিরই ব্যবস্থা। ফিরে এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্, আপনার ইয্‌যত ও প্রতাপের কসম, যে-ই জাহান্নামের শাস্তির কথা শুনবে সে এতে প্রবেশ করতে চাবে না। অতঃপর জাহান্নামের উপর প্রবৃত্তির তাড়না ও কামনা-বাসনার পর্দা ঢেলে দেওয়া হলো। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে বললেন, পুনরায় গিয়ে দেখ। তিনি দেখে এসে বললেন,

আপনার ইয্যত ও প্রতাপের কসম, আমার আশংকা হয় যে, সকলকেই জাহান্নামে যেতে হবে।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) হযরত ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ)-সূত্রে রেওয়ায়াত করেন যে,

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۝

"তা' (জাহান্নাম) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করতে থাকবে।" (মুরসালাত ঃ ৩২)

কুরআনের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আমি একথা বলি না যে, দোযখের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এক একটি বৃক্ষের মত বড় হবে, বরং আমি বলি এক একটি স্ফুলিঙ্গ বিরাট দুর্গের মত এবং বিরাট শহরের মত বড় হবে। আহমদ্ ইব্নে মাজাহ্ ও হাকেম (রহঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, দোযখের মধ্যে 'ওয়াইল' নামক একটি উপত্যকা রয়েছে, তাতে কোন কাফের নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তলদেশে পৌঁছা পর্যন্ত সত্তর বছর লাগবে।

তিরমিযী শরীফে আছে, বস্তুতঃ 'ওয়াইল' হচ্ছে, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি উপত্যকা। এতে নিক্ষিপ্ত কাফের সত্তর বছরে এর তলদেশে গিয়ে পৌঁছবে।

তিরমিযী শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, তোমরা জুব্বুল-হুয্ন (অর্থাৎ দুঃখ-কষ্টের গর্ত) থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর, সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সে গর্তটি কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জওয়াব দিলেন, দোযখের মধ্যে এমন একটি ভয়ানক ওয়াদী (উপত্যকা) যা থেকে স্বয়ং দোযখ প্রতিদিন চারশত বার আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে। আরজ করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল, এতে কারা দাখেল হবে? তিনি বললেন, এ উপত্যকাটি লোকদেখানো মনোবৃত্তি নিয়ে কুরআন পাঠকারী লোকদের জন্য তাদের অসৎ আমলের দরুন তৈরী করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য ক্বারী সে, যে জালেম শাসকদের সাক্ষাতের অভিলাষী হয়।

ত্বব্রানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, দোযখের মধ্যে একটি উপত্যকা রয়েছে, যা থেকে স্বয়ং দোযখ প্রত্যহ চারশত বার পানাহ্ চেয়ে থাকে, উম্মতে-মুহাম্মদীর রিয়াকার (লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদতকারী) লোকদের জন্য

তা প্রস্তুত করা হয়েছে।

ইব্নে আবিদ্দুন্‌য়া বর্ণনা করেছেন, দোযখের মধ্যে সত্তর হাজার উপত্যকা রয়েছে, এর প্রত্যেকটি থেকে সত্তর হাজার শাখা নির্গত হয়েছে, আবার প্রত্যেকটি শাখার জন্য সত্তর হাজার ঘর রয়েছে এবং প্রতিটি ঘরে একটি করে সাপ রয়েছে—এ সাপগুলো দোযখীদের মুখে অবিরত আঘাত হানছে।

তারীখে বুখারীতে মুন্‌কার সনদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, দোযখে সত্তর হাজার উপত্যকা আছে, প্রত্যেকটি উপত্যকার সত্তর হাজার শাখা রয়েছে, প্রতিটি শাখার সত্তর হাজার ঘর রয়েছে, প্রতিটি ঘরে সত্তর হাজার কুয়া রয়েছে, প্রতিটি কুয়াতে সত্তর হাজার অজগর সাপ রয়েছে এবং প্রতিটি সাপের চোয়ালে (দাঁত-সংলগ্ন মুখ-গহ্বর) সত্তর হাজার বিচ্ছু রয়েছে— যখনই কোন কাফের বা মুনাফেক সেখানে পৌঁছে, এগুলো তাদের উপর আঘাত হানতে শুরু করে।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, একটি বড় পাথর দোযখের কিনার হতে নিক্ষেপ করা হলে সত্তর বছর যাবৎ তা দোযখের গহ্বরে ধাবিত হতে থাকবে, তবুও শেষ প্রান্তে পৌঁছবে না।

হযরত উমর (রাযিঃ) প্রায়ই বলতেন, তোমরা দোযখের কথা বেশী করে স্মরণ কর, কারণ দোযখাগ্নির তাপ খুবই প্রচণ্ড, এর গভীরতা বহু দূর পর্যন্ত এবং দণ্ড-প্রয়োগের চাবুক লোহার।

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের দরবারে বসা ছিলাম ; এমন সময় হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম—যেন উপর থেকে কি একটা নীচে পড়লো। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি জান এটা কি? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা একটা পাথরের শব্দ, সত্তর বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে দোযখে নিক্ষেপ করেছেন এখন তা নীচে গিয়ে পৌঁছলো।

ত্বব্রানী শরীফে হযরত আবূ সাঈদ (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ভয়ানক আওয়াজ শুনতে

পেলেন। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) আগমন করলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি একটি পাথর, সত্তর বছর পূর্বে এটাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আর এখন তা দোযখের নীচে গিয়ে পৌছলো। আল্লাহ্ তা'আলার মর্জ্জি হয়েছে, আপনাকে তা শুনিয়ে দিলেন। এরপর থেকে ওফাত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখন মুখভরে হাসতে দেখা যায় নাই।

আহ্‌মদ ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে— মাথার খুলির প্রতি ইশারা করে বললেন, এমন একটি পাথর যদি আসমান থেকে যমীনের দিকে নিক্ষেপ করা হয়, তবে রাত্র হওয়ার আগেই তা যমীনে পৌছে যাবে, অথচ এ দুইয়ের মাঝে দূরত্ব রয়েছে পাঁচশত বছরের। কিন্তু এ পাথরটিই যদি দোযখের শিকলের শুরু-ভাগ থেকে নিক্ষেপ করা হয়, তবে শিকলের শেষ পর্যন্ত তা পৌছতে চল্লিশ বছর লাগবে—যদি রাত্র দিন একাধারে স্বাভাবিকভাবেও চলতে থাকে।

আহমদ, আবূ ইয়া'লা ও হাকেম রেওয়ায়াত করেন, দোযখের লোহার গদা (মুগুর) যদি যমীনের উপর রাখা হয় এবং সমগ্র জ্বিন ও মানবজাতি তা উঠাতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালায়, তবু তাদের পক্ষে তা উঠানো সম্ভব হবে না। হাকেমের বর্ণনায় রয়েছে যে, দোযখের হাতুড়ি দিয়ে যদি আঘাত করা হয়, তবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছাই-ভস্মের ন্যায় হয়ে যাবে।

ইব্‌নে আবিদ্দুন্‌য়ার রেওয়ায়াতে আছে যে, দোযখের একটি পাথরও যদি দুনিয়ার পাহাড়সমূহের উপর রাখা হয়, তবে সমগ্র পাহাড় বিগলিত হয়ে যাবে, অথচ প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি পাথর ও একটি শয়তান রয়েছে।

হাকেমের রেওয়ায়াতে আছে যে, যমীনের সাতটি স্তর রয়েছে, এবং এক স্তর থেকে অপর স্তর পর্যন্ত ব্যবধান হচ্ছে পাঁচশত বছরের। সর্বোচ্চ স্তরটি রয়েছে একটি মৎস্যের পিঠের উপর। মৎস্যটির বাহু দু'টি আসমানের সাথে মিলিত হয়েছে। আর মৎস্যটি অবস্থিত একটি পাথরের উপর। পাথরটি রয়েছে এক ফেরেশ্‌তার হাতে। দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে প্রবল ঘূর্ণি ও ঝঞ্ঝাবাত্যার বন্দীখানা। আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন, তখন ঘূর্ণিঝড়ের দারোগাকে হুকুম করলেন তাদের উপর প্রবল ঝড়ো হাওয়া

প্রবাহিত করে তাদেরকে ধ্বংস করতে। তখন দারোগা বলেছে, হে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য আমি কি গাভীর নাসিকা পরিমাণ ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত করবো! আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, এতে সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী ধ্বংস হয়ে যাবে, বরং তাদের উপর আংটি পরিমাণ হাওয়া প্রবাহিত কর।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ۝

"তা (ঝঞ্ঝা বায়ু) যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হতো, তাকে এমন করে ছাড়তো যেমন কোন বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।" (যারিয়াত ঃ ৪২)

যমীনের তৃতীয় স্তরে রয়েছে দোযখের পাথর। চতুর্থ স্তরে রয়েছে গন্ধক (অগ্নি-প্রজ্জ্বলন পদার্থ) সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দোযখেরও আবার গন্ধক রয়েছে? আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ, ওই পবিত্র সত্তার কসম, যার কুদরতের মুঠোয় আমার প্রাণ, দোযখের মধ্যে গন্ধকের বহু উপত্যকা (ওয়াদী) রয়েছে, যদি এগুলোর মধ্যে অতি বৃহৎ ও মজবুত পাহাড় রেখে দেওয়া হয়, তবে তা বিগলিত ও দ্রবীভূত হয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে।

যমীনের পঞ্চম স্তরে দোযখের সাপ রয়েছে। এক একটি উপত্যকার ন্যায় বৃহৎ তাদের মুখ-গহবর। যখন কোন কাফেরকে দংশন করবে, তখন তার শরীরে গোশ্‌ত বলতে কিছু অবশিষ্ট রাখবে না।

যমীনের ষষ্ঠ স্তরে রয়েছে দোযখের বিচ্ছু। এক একটি বিচ্ছু মোটা খচ্চরের মত বৃহদাকার হবে। এদের দংশন এতো মারাত্মক হবে যে, কষ্টের আতিশয্যে দংশিত কাফের দোযখাগ্নির কষ্ট ভুলে যাবে।

যমীনের সপ্তম স্তরে ইব্‌লীস শয়তান লোহার জিঞ্জীরে পেঁচানো অবস্থায় রয়েছে। তার এক হাত সম্মুখে অপর হাত পিছনে রয়েছে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে ছেড়ে দিয়ে কোন বান্দাকে পরীক্ষা করতে চান, তখন তাকে (ইব্‌লীসকে) আযাদ করে দেন।

আহমদ, ত্ববরানী, ইব্‌নে হাব্বান ও হাকেমে বর্ণিত আছে যে, দোযখের মধ্যে বখতী উটের গর্দানের মত মোটা ও লম্বা সাপ রয়েছে। এগুলো কাউকে

দংশন করলে সত্তর বছর পর্যন্ত এর বিষাক্ত ব্যথা-বেদনা যন্ত্রণা দিতে থাকবে। দোযখের অভ্যন্তরে খচ্চরের ন্যায় মোটা মোটা বিচ্ছু রয়েছে, কাউকে দংশন করলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিষ-যন্ত্রণায় অস্থির করে রাখবে।

তিরমিযী, ইবনে হাব্বান ও হাকেমে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, কুরআনের আয়াতাংশ كَالْمُهْلِ (তৈলের গাদের ন্যায়)-এর অর্থ হচ্ছে, দোযখীদেরকে এমন তীব্র ও উত্তপ্ত তৈলের গাদের ন্যায় ঘৃণ্য পানীয় পান করতে দেওয়া হবে যে, তা নিকটে আনা মাত্র এর উত্তাপে চেহারা দগ্ধ হয়ে চামড়া খসে পড়বে।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, উত্তপ্ত গরম পানি দোযখীদের মস্তকের উপর প্রবাহিত করা হবে এবং তা মস্তক ভেদ করে পেটের অভ্যন্তরে পৌঁছে যাবে এবং পেটের সবকিছু বের করে দিবে। এমনকি পা পর্যন্ত সবকিছু জ্বালিয়ে দিবে। কুরআনের শব্দ 'হামীম' এর অর্থ হচ্ছে, উত্তপ্ত ও দগ্ধকর পানি।

হযরত যাহহাক (রহঃ) বলেন, দোযখের এই উত্তপ্ত পানি যমীন-আসমান সৃষ্টির দিন থেকে ফুটানো হচ্ছে এবং দোযখীদেরকে পান করানোর পূর্ব পর্যন্ত তা অবিরাম ফুটানো হবে।

এছাড়া আরও একটি উক্তি রয়েছে, যা কুরআনের এ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝

"তাদেরকে (দোযখীদেরকে) ফুটন্ত পানি পান-করানো হবে। ফলে তা' তাদের নাড়ি-ভুড়িগুলোকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলবে।" (মুহাম্মদ ঃ ১৫)

আহমদ, তিরমিযী ও হাকেম রেওয়ায়াত করেন ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের আয়াত—

وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ۝ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ

("পূঁজ ও রক্ত-সদৃশ পানি তাকে পান করানো হবে, যা ঢোক্ ঢোক্ করে পান করবে এবং সহজে গলধঃকরণ করতে পারবে না।"ইব্রাহীম ঃ

১৬)-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, যখন এ পানি তার মুখের নিকটবর্তী করা হবে, তখন সে তা না-পছন্দ করবে এবং পান করতে চাইবে না। যখন আরও নিকটবর্তী করা হবে, তখন তার মুখমণ্ডল ঝলসে যাবে এবং মস্তকস্থিত চামড়া দগ্ধ হয়ে পড়ে যাবে। যখন পানি পান করবে, তখন তার নাড়ি-ভুড়ি কেটে যাবে এবং পিছন-পথ দিয়ে বের হয়ে পড়ে যাবে।

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেন ঃ

يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ

"মুখমণ্ডলকে ভুনে ফেলবে ; তা কতই না নিকৃষ্ট পানীয়।"

(কাহ্ফ ঃ ২৯)

আহমদ ও হাকেম রেওয়ায়াত করেন যে, 'গাস্সাক' অর্থাৎ দোযখের দুর্গন্ধময় পূঁজ এক বাল্তি পরিমাণ যদি দুনিয়াতে ঢেলে দেওয়া হয়, তবে সমগ্র জগত দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। 'গাস্সাকে'র বিষয় কুরআনুল করীমে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۝

"তা ফুটন্ত পানি ও পূঁজ। অতএব, তারা তা আস্বাদন করুক।"

(ছোয়াদ ঃ ৫৭)

আরও উল্লেখিত হয়েছে ঃ

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۝

"উত্তপ্ত পানি ও পূঁজ ব্যতীত।" (নাবা ঃ ২৫)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)-এর অভিমত অনুযায়ী 'গাসসাক' হচ্ছে, দোযখের দুর্গন্ধময় পানি, যা কাফের ও অন্যান্যদের চামড়া বিগলিত হয়ে সৃষ্টি হবে। কোন কোন ব্যাখ্যাতা বলেন, 'গাস্সাক' হচ্ছে দোযখীদের পূঁজ।

হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলেন, 'গাস্সাক' দোযখস্থিত একটি ঝর্ণা। এ ঝর্ণার দিকে উত্তপ্ত পানির আরও অন্যান্য ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। প্রতিটি ঝর্ণা

সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ। দোযখী ব্যক্তিকে এর মধ্যে একবার মাত্র চুবিয়ে বের করা হবে। এতে তার অবস্থা এই হবে যে, শরীরের চামড়া ও গোশ্ত তার সর্বশরীর থেকে খসে পড়বে। শুধু হাড়গুলো অবশিষ্ট থাকবে। আর এসব গোশ্ত ও চামড়া একত্র হয়ে তার পশ্চাদ্দেশে এবং গোড়ালির সাথে ঝুলতে থাকবে। এগুলো সহ টেনে সে চলতে থাকবে, যেমন মানুষ নিজের কাপড় টেনে চলতে থাকে।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ٥

"তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যেমন ভয় করা তাঁর হক রয়েছে। আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মরো না।" (আলি-ইম্রান ঃ ১০২)

অতঃপর তিনি বললেন, যদি 'যাক্কূম' (দোযখের কাটাযুক্ত খাদ্য)-এর বিন্দু পরিমাণও দুনিয়ার কোন স্থানে নিক্ষেপ করা হয়, তাতে সমগ্র জগৎবাসীর জীবন নির্বাহ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে এ 'যাক্কুম' যাকে খাওয়ানো হবে, তার কি দশা হবে? অন্য রেওয়ায়াতে আছে, সে ব্যক্তির কি দশা হবে, যার খাদ্য হবে শুধু 'যাক্কূম'।

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত আছে ঃ

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ

"(গলায় আটকানোর মত) কাটাযুক্ত খাদ্য।" (মুয্যাম্মিল ঃ ১৩)

তিনি বলেন, এ কাঁটা তার গলদেশে এমনভাবে আটকে যাবে যে, তা বের করতে পারবে না এবং বমনও করতে পারবে না।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, কাফেরের দুই কাঁধের মাঝখানে দ্রুতগামী সওয়ারীর তিন দিনের পথ পরিমাণ দূরত্ব হবে।

মুসনাদে আহমদ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, কাফেরের চোয়াল-দাঁত উহুদ পাহাড়ের ন্যায় বড় হবে, তার উরু 'বায়যা' পাহাড়ের ন্যায় হবে, দোযখে তার পশ্চাদ্দেশ 'কুদাইদ' থেকে মক্কা পর্যন্ত দূরত্বের সমান হবে। যে দূরত্ব

অতিক্রম করতে তিন দিবস সময় লাগে। তার শরীরের চামড়ার স্থূলতা হবে জেবার অর্থাৎ ইয়ামান সম্রাটের যুগে প্রচলিত মাপ অনুপাতে বিয়াল্লিশ হাত।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, দোযখের মধ্যে দোযখী ব্যক্তির পশ্চাদ্দেশ 'রাবাযাহ্' থেকে মদীনা পর্যন্ত তিন দিনের দূরত্বের সমান হবে।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত ফুযাইল ইব্নে ইয়াযীদ (রাযিঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ কাফেরের জিহ্বা এতো বৃহৎ ও দীর্ঘ হবে যে, এক ফরসখ বা দুই ফরসখ (প্রায় আট কিঃ মিঃ) পর্যন্ত হেঁচড়াতে থাকবে। লোকেরা সেটাকে পদদলিত করবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দোযখের মধ্যে দোযখীদের দেহ এতো বৃহদাকার করে দেওয়া হবে যে, কানের নিম্নভাগ থেকে কাঁধ পর্যন্ত সাতশত বছরের দূরত্ব হবে। শরীরের চামড়া সত্তর হাত মোটা হবে চোয়াল উহুদ পাহাড়ের ন্যায় হবে।

আহমদ ও হাকেম রেওয়ায়াঁত করেছেন, হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন ঃ তোমরা কি জান, দোযখের প্রশস্ততা কতটুকু? আমি বললাম—না। তখন তিনি বললেন ঃ দোযখীর কানের নিম্নভাগ থেকে কাঁধ পর্যন্ত সত্তর বছরের দূরত্ব ; এর মাঝখানে পূঁজ ও রক্তের উপত্যকাসমূহ রয়েছে। আমি বললাম, ঝর্ণাসমূহ? তিনি বললেন, না, উপত্যকাসমূহ।

অধ্যায় ঃ ৫২

গোনাহ্ বা পাপকার্যে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকার ফযীলত

আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা ও পাপকার্যে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য সবচেয়ে বেশী সহায়ক বিষয় হলো খওফে খোদা, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ভয় অন্তরে জাগরুক রাখা, তাঁর শাস্তির কথা স্মরণ করা, তাঁর অসন্তুষ্টি ও পাকড়াওয়ের কথা মনে করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ
اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

"যারা আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করে, তাদের ভয় হওয়া উচিত যে, তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, কিংবা তাদের উপর কোন যন্ত্রণাময় আযাব নাযিল হয়। (সূরা নূর, আয়াত ঃ ৬৩)

বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুমূর্ষু নওজওয়ানের নিকট তশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন তার মৃত্যু একেবারেই সন্নিকটবর্তী ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ মুহূর্তে তোমার ভিতরের অনুভূতি কি? সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মনে আশার সঞ্চার হয় এবং গুনাহের কারণে বড় ভয়ও অনুভব করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ এরূপ অবস্থায় কোন বান্দার অন্তরে এ দু'টি (আশা ও ভয়) বিষয় একত্রিত হলে, আল্লাহ্ পাক তাকে অবশ্যই আশানুরূপ দান করেন এবং যে বিষয় থেকে সে ভয় করেছে, তা থেকে মুক্তি দেন।"

হযরত ওয়াহ্ব ইব্নে ওয়ারদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত,—হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, "জান্নাতের মহব্বত ও দোযখের ভয় মানুষকে ধৈর্য ধারণ, পার্থিব

ভোগ-বিলাস বর্জন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ও পাপাচার পরিহারে অভ্যস্থ করে তোলে।" হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন, তোমাদের পূর্বে যেসব মনীষী (সাহাবায়ে কেরাম) গুজরে গিয়েছেন, তারা গোটা পৃথিবীর অসংখ্য কংকরের সমপরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্র রাস্তায় দান করলেও পাপের ভয় ও আশংকায় শঙ্কিত থাকতেন ; পারলৌকিক মুক্তি ও পরিত্রাণের আশা পোষণ করতেন না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি যা শুনতে পাই তোমরা কি তা শুনতে পাও? আমি শুনছি—আকাশমণ্ডলী কড় কড় আওয়াজ করছে।

ওই পবিত্র সত্তার কসম, যার কুদরতের মুঠোয় আমার জীবন, আসমানে চার অঙ্গুলি পরিমাণ জায়গাও এমন নাই, যেখানে কোন ফেরেশ্তা আল্লাহ্র সামনে সেজদা অথবা দাঁড়ানো অথবা রুকূর হালতে মগ্ন না রয়েছে। আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে অবশ্যই তোমরা বেশী কাঁদতে এবং কম হাসি-রসিকতা করতে এবং তোমরা জনপদ ছেড়ে পাহাড়-পর্বতের দিকে ছুটে যেতে। সেখানে তোমরা আল্লাহ্র ভয়াবহ ও কঠিনতম শাস্তি থেকে পানাহ চাইতে।

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে—"তোমরা কেউ বলতে পার না, আল্লাহ্র কাছে তোমরা পরিত্রাণ পাবে কি পাবে না।" বকর ইব্নে আব্দুল্লাহ্ মুযানী (রহঃ) বলেন, "মানুষ হাস্য-উল্লাসে পাপাচারে লিপ্ত হচ্ছে, কিন্তু তাদের কাঁদতে কাঁদতে দোযখে যেতে হবে।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মানুষ যদি জানতো, আল্লাহ্র কাছে কি কি আযাব রয়েছে, তাহলে তারা দোযখের শাস্তি থেকে শঙ্কামুক্ত হতে পারতো না।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আয়াত নাযিল হলো ঃ

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ○

"এবং আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করুন।" (শুআরা ঃ ২১৪) তখন তিনি বলেছেন ঃ হে কুরাইশ গোত্রের লোকজন!

তোমাদের চিন্তা তোমরা নিজেরাই কর ; আল্লাহ্‌র কাছে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমি তোমাদের কিছুই করতে পারবো না। হে বনী আব্‌দে মনাফ! আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে বাঁচানোর জন্য আমি তোমাদের কোনই কাজে আসবো না। হে আব্বাস! আমি আল্লাহ্‌র কাছে আপনার জন্যে কিছুই করতে পারবো না। হে ছফিয়্যাহ্ (নবীজীর ফুফু)! আল্লাহ্‌র কাছে আপনার জন্যে আমি কিছুই করতে পারবো না। হে ফাতেমা! আমার সম্পদ থেকে তুমি যে পরিমাণ ইচ্ছা কর নিয়ে যাও ; কিন্তু আখেরাতে আল্লাহ্‌র কাছে আমি তোমার কোন সাহায্য করতে পারবো না। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কুরআনের এ আয়াতে ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ

(অর্থাৎ, আর যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে—যা কিছু দান করে থাকে এবং তাদের অন্তরসমূহ ভীত থাকে এ কথার জন্য যে, তাদেরকে স্বীয় রব্বের নিকট ফিরে যেতে হবে। মুমিনূন ঃ ৬০) যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা যদি চুরি করে, ব্যভিচার করে, শরাব পান করে, কিন্তু আল্লাহ্‌কে ভয় করে থাকে, তবে এরাও কি এ আয়াতের প্রশংসার অন্তর্ভুক্ত? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জওয়াব দিলেন, হে আবূ বকরের কন্যা, হে সিদ্দীকের কন্যা! এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ওই সকল লোক, যারা নামায পড়ে, রোযা রাখে, দান-খয়রাত করে এবং সর্বদা শঙ্কিত থাকে যে, জানিনা আমার আমল আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হবে কি-না। (আহ্‌মদ)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল, হে সাঈদের পিতা! বলুন তো, আমরা অনেক সময় লোকদের সাহচর্যে বসি, তারা আমাদেরকে আখেরাতের ব্যাপারে কেবল আশাপ্রদ কথাই বলেন এবং তাতে আমরা এতো আনন্দিত হই, যেন আকাশে উড়তে থাকি। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, যাদের সংশ্রবে আশাপ্রদ কথা শুনছ, পরে আখেরাতে ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়—এতোদপেক্ষা উত্তম হলো, এমন লোকদের সংশ্রব অবলম্বন কর, যারা দুনিয়াতে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ও আখেরাতের ভীতি প্রদর্শন করে এবং পরিশেষে (আখেরাতে) সুখ ও শান্তিপ্রাপ্ত হও।

হযরত উমর (রাযিঃ) জীবনের শেষভাগে যখন আঘাতপ্রাপ্ত হলেন এবং মৃত্যু অতি সন্নিকটবর্তী হলো, তখন তিনি স্বীয় পুত্রকে বললেন, ওহে! আমার গণ্ড মাটির সাথে মিশিয়ে রাখ, জানিনা আখেরাতে আমার কি পরিণতি হবে। আল্লাহ্ পাক যদি আমার উপর রহম না করেন, তবে আমার কোন উপায় নাই। হযরত উমর (রাযিঃ)-এর এই ভীতিগ্রস্ততা দেখে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) তাঁকে বললেন, হে আমীরুল মুমেনীন, আপনি ভীত-সন্ত্রস্ত হচ্ছেন, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার দ্বারা প্রচুর এলাকা মুসলমানদের হাতে এনে দিয়েছেন, বহু শহর আপনার দ্বারা আবাদ করিয়েছেন। এ ছাড়াও ইসলাম ও মুসলমানদের আরও অনেক উপকার ও কল্যাণ আপনার দ্বারা সাধিত হয়েছে। হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, "আমি শুধু নাজাতটুকু পেয়ে যেতে চাই—অপরাধে ধরা না পড়ি।'

হযরত যয়নুল আবেদীন ইব্‌নে আলী ইব্‌নে হুসাইন (রাযিঃ) যখন উযূ করতেন এবং উযূ সম্পন্ন করে দাঁড়াতেন, তখন তিনি রীতিমত কাঁপতে থাকতেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, ওহে! তোমরা কি জানোনা, আমি কত বড় মহান সত্তার দরবারে দণ্ডায়মান হবো এবং তাঁর কাছে অতি একান্তে আরয-নিয়ায করবো?

হযরত আহ্‌মদ ইব্‌নে হাম্বল (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র ভয় আমাকে পানাহার থেকেও ফিরিয়ে রেখেছে, এমনকি খাদ্যের প্রতি আমার মনে কোনরূপ আগ্রহই সৃষ্টি হয় না।

বুখারী মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনেও আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন, যেদিন আরশের এই ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক হচ্ছে, যারা একাকীত্বে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সতর্কবাণী ও শাস্তির কথা স্মরণ করে, নিজের অবাধ্যতা ও গুনাহের কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়, ফলে তওবা ও অনুশোচনার অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গণ্ডদেশ সিক্ত করে।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

দোযখের আগুন সেই চক্ষুকে কোনদিন স্পর্শ করবে না, যে চক্ষু আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁদেছে। এমনিভাবে যে চক্ষু আল্লাহ্ পথে প্রহরায় জাগ্রত রয়েছে, তাকেও আগুন স্পর্শ করবে না।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا عَيْنًا غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ وَعَيْنًا سَهِرَتْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَيْنًا يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى

"সকল চোখই কেয়ামতের দিন রোদন করবে—কেবলমাত্র ঐ চোখগুলো ছাড়া, যেগুলো আল্লাহ্‌র নিষেধ করা বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত রয়েছে, কিংবা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ ও মুজাহাদায় মগ্ন থাকার দরুন রাতে জাগ্রত রয়েছে অথবা আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করে মক্ষিকার মস্তক হলেও পরিমাণ অশ্রুপাত করেছে।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে আরও বর্ণিত, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সে ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করবে না, যে আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদন করেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না স্তন থেকে নির্গত দুধ পুনরায় স্তনে প্রবেশ করবে (অর্থাৎ অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদনকারী ব্যক্তিরও দোযখে প্রবেশ করা অসম্ভব)। আল্লাহ্‌র পথের ধূলা ও দোযখাগ্নির ধোয়া কখনও একত্রিত হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে আমর ইব্‌নে আস্ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র ভয়ে এক ফোঁটা অশ্রুপাত করা আমার নিকট এক হাজার দীনার সদকা করা অপেক্ষা প্রিয়।

হযরত আউন ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ (রহঃ) বলেন, আমার কাছে এ হাদীস পৌছেছে যে, আল্লাহ্‌র ভয়ে প্রবাহিত অশ্রু শরীরের যে অংশে পতিত হবে, সে অংশটুকু দোযখের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদন করতেন তাঁর সীনা মুবারকের অভ্যন্তর থেকে এমন আওয়াজ শ্রুত হতো, যেমন উত্তপ্ত ডেগ্‌চির ভিতর থেকে আওয়াজ বের হয়।

হযরত কিন্দী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদনকারীর অশ্রু কয়েক সাগর পরিমাণ অগ্নি নিভিয়ে দিতে পারে।

হযরত ইব্‌নে সিমাক (রহঃ) নিজেই নিজকে শাসন করে বলতেন, ওহে! তুমি খোদাভক্ত ও ধর্মনিষ্ঠ লোকের ন্যায় কথা বল কিন্তু কাজ কর মুনাফেকের মত—সেসঙ্গে আবার জান্নাতে প্রবেশের আশাও পোষণ কর ; না না; জান্নাতে প্রবেশকারী লোকজন এরূপ নয়, তাদের আমল-আখলাকই ভিন্ন, যা তোমার মধ্যে নাই।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম, হে রাসূলের বংশধর! আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বললেন, হে সুফিয়ান! মিথ্যাবাদী কোনদিন মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে না, হিংসুক কোনদিন শান্তি পেতে পারে না, সর্বক্ষণ বিষন্ন ব্যক্তি কোনদিন কল্যাণ পেতে পারে না, রুক্ষ স্বভাবের লোক কোনদিন নেতৃত্ব লাভ করতে পারে না। আমি আরজ করলাম, হে নবীর বংশধর! আমাকে আরও নসীহত করুন। তিনি বললেন, হে সুফিয়ান! আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে চল, তাহলে তুমি আবেদ (ইবাদতকারী) হতে পারবে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ভাগ্যে যা রেখেছেন, তাতে তুমি সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তুমি মুসলিম হতে পারবে, লোকজনের সাথে তুমি এমন ব্যবহার কর যেমন তুমি তাদের কাছে পেতে চাও, তাহলে তুমি মুমিন হতে পারবে, দুশ্চরিত্র লোকের সাহচর্য গ্রহণ করো না, তারা তোমাকে মন্দ চরিত্রই শিক্ষা দিবে। কেননা, হাদীস শরীফে আছে, "বন্ধুর অনুকরণ মানুষের সহজাত বৃত্তি, কাজেই তোমাদের কেউ কারও সাথে বন্ধুত্ব করতে চাইলে সে যেন পূর্বেই দেখে নেয় যে বন্ধুরূপে কাকে গ্রহণ করছে।" নিজের ব্যাপারে এমন লোকের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ কর, যে আল্লাহ্‌কে

ভয় করে। আমি আরজ করলাম, হে আওলাদে রাসূল! আমাকে আরও নসীহত করুন। তিনি বললেন, হে সুফিয়ান! যে ব্যক্তি গোত্র ও জনবল ব্যতীত ইযযত-সম্মান ও বিজয় হাসিল করতে চায়, কিংবা রাজত্ব ও সাম্রাজ্য ব্যতীত মর্যাদা ও প্রভাব অর্জন করতে চায়, তার উচিত, সে যেন আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার লাঞ্ছনা হতে বের হয়ে তাঁর আনুগত্যের প্রতি আগুয়ান হয়। আমি আরজ করলাম, হে আওলাদে রাসূল! আমাকে আরও উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বললেন, আমার পিতা আমাকে তিনটি আদব শিখিয়েছেন ঃ এক, যে ব্যক্তি অসৎ লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে, সে তার অনিষ্ট হতে বাঁচতে পারবে না। দুই, যে ব্যক্তি অসৎ পরিবেশে যাবে, সে অপবাদ থেকে বাঁচতে পারবে না। তিন, 'যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করবে না, সে লজ্জিত ও অপমানিত হবে।

হযরত ইব্‌নে মুবারক (রহঃ) বলেন, আমি ওয়াহ্‌ব ইব্‌নে ওয়ারদ (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র না-ফরমানী করে সে কি ইবাদত-বন্দেগীর স্বাদ আস্বাদন করতে পারে? তিনি বলেছেন, কস্মিনকালেও না; এমনকি যে আল্লাহ্‌র না-ফরমানীর ইচ্ছাও অন্তরে পোষণ করে, সে-ও ইবাদতে স্বাদ পেতে পারে না।

ইমাম আবুল ফরজ ইব্‌নে জাওযী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র ভয়ই একমাত্র আগুন, যা কুপ্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে জ্বালিয়ে দিতে পারে। এ খোদা-ভীতির মাহাত্ম্য ও ফযীলত ঠিক সেই পরিমাণ যে পরিমাণ সে কামনা-বাসনাকে জ্বালাতে পারে, যে পরিমাণ সে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে বাঁচাতে পারে এবং যে পরিমাণ সে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে।

আল্লাহ্‌র খওফ ও ভয়ের প্রচুর ফযীলত ও মাহাত্ম্য এজন্যেই যে, এরই ওসীলায় মানব-চরিত্রে তাক্‌ওয়া-পরহেয্‌গারী, সততা ও সাধুতা, মুজাহাদা ও কৃচ্ছ্র সাধনা এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য পয়দা হয়। কুরআনের আয়াত ও বহু হাদীসে এ কথার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ

هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ٥

"হেদায়াত ও রহমত সে সমস্ত লোকের জন্য, যারা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে।" (আ'রাফ ঃ ১৫৪)

আল্লাহ্‌ পাক আরও ইরশাদ করেন ঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ٥

"আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। এ (সন্তুষ্টি) তাদের জন্য যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে।"
(বাইয়্যিনাহ্‌ ঃ ৮)

আরও ইরশাদ করেন ঃ

وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ٥

"এবং তোমরা আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।" (আলি ইমরান ঃ ১৫৭)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ٥

"এবং যারা আপন প্রতিপালককের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয় ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে বেহেশ্‌তে দু'টি উদ্যান।"
(আর-রহমান ঃ ৪৬)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ٥

"উপদেশ সে ব্যক্তিই গ্রহণ করে, যে ভয় করে।". (আ'লা ঃ ১০)

আল্লাহ্‌ পাক আরও বলেন ঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۚ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌কে ভয় করে তার বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই।" (ফাতির ঃ ২৮)

এছাড়া আরও অনেক আয়াত উপরোক্ত বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ রয়েছে।

ইল্‌মের ফযীলত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসসমূহও আল্লাহ্‌-ভীতির ফযীলত ও মাহাত্ম্যকেই বুঝায়। কেননা, আল্লাহ্‌-ভীতি প্রকৃতপক্ষে ইল্‌মেরই ফলস্বরূপ।

ইব্‌নে আবিদ্দুন্‌য়া (রহঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "বান্দার অন্তর যখন আল্লাহের ভয়ে কেঁপে উঠে, তখন তার গুনাহ্‌ এমনভাবে ঝরে পড়ে যেমন শুক্‌না বৃক্ষের পাতা ঝরে পড়ে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, "আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার বান্দার মধ্যে দু'টি ভয় একত্র করি না, এমনিভাবে তাকে দু'টি নিরাপত্তা বা শান্তি একসাথে প্রদান করি না—দুনিয়াতে সে যদি আমা হতে নির্ভীক থাকে, তাহলে কেয়ামতের দিন আমি তাকে ভীত রাখবো। আর যদি দুনিয়াতে সে আমাকে ভয় করে, তাহলে কেয়ামতের দিন আমি তাকে নির্ভয় প্রদান করবো।"

হযরত আবূ সুলাইমান দাররানী (রহঃ) বলেন, যে অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় নাই, সে অন্তর উজাড় বা বিধ্বস্ত অন্তর।

আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ

إِنَّهُ لَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ۝

"বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র পাকড়াও হতে কেউ নিশ্চিত হয় না কেবল ঐ সকল লোক ব্যতীত যাদের দুর্গতিই উপস্থিত হয়েছে।" (আ'রাফ ঃ ৯৯)

অধ্যায় ঃ ৫৩

তওবার ফযীলত গুরুত্ব ও তাৎপর্য

তওবার ফযীলত, গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

"হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র সমীপে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।" (নূর ঃ ৩১)

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۝ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝

"আর যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মাবূদের উপাসনা করে না এবং আল্লাহ্‌ যাকে (হত্যা করা) হারাম করে দিয়েছেন তাকে হত্যা করে না শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত এবং তারা ব্যভিচার করে না, আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে, তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। ক্বিয়ামত দিবসে তার শাস্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সে এতে অনন্তকাল লাঞ্ছিত অবস্থায়

থাকবে। কিন্তু যারা তওবা করে নেয় এবং ঈমান আনয়ন করে এবং নেক কাজ করতে থাকে, এরূপ লোকদেরকে আল্লাহ্ তাদের পাপসমূহের পরিবর্তে পুন্যসমূহ দান করবেন ; আর আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময়। আর যে ব্যক্তি তওবা করে ও নেক কাজ করে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিশেষভাবে প্রত্যাবর্তন করছে। (ফুরক্বান ঃ ৬৮-৭১)

তওবা প্রসঙ্গে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও প্রচুর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম শরীফে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা দিবসে পাপকার্যে লিপ্ত লোকদের গুনাহমাফী ও তওবা কবূলের জন্য রাত্রিতে তাঁর দয়ার হস্ত প্রসারিত করেন এবং রাত্রিকালে পাপাচারে লিপ্ত লোকদের গুনাহ্মাফী ও তওবা কবূলের জন্য দিবসে হাত প্রসারিত করেন। পশ্চিম দিকে হতে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তওবা কবূলের জন্য ডাকতে থাকবেন।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, পশ্চিম দিকে একটি দরজা খোলা হয়েছে, তা সত্তর বৎসরের মতান্তরে চল্লিশ বৎসরের রাস্তার দূরত্ব পরিমাণ বিস্তৃত। আসমান-যমীন সৃষ্টি হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত সেই দরজা তওবা কবূলের জন্য খোলা রয়েছে এবং পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত খোলা থাকবে, কখনও বন্ধ হবে না।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, তওবাকারীদের জন্য পশ্চিম দিকে সত্তর বছরের পথ পরিমাণ দূরত্বের প্রস্থ সম্বলিত একটি দরজা আছে, সেদিক থেকে সূর্যোদয় না-হওয়া পর্যন্ত তা বন্ধ হবে না। এদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا

"যেদিন আপনার প্রতিপালকের বড় নিদর্শন এসে পৌছবে, (সেদিন) কোন এইরূপ ব্যক্তির ঈমান তার কাজে আসবে না।" (আনআম ঃ ১৫৮)

ত্ববরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, বেহেশ্‌তের আটটি দরজার মধ্যে শুধুমাত্র তওবার একটি দরজা ছাড়া আর সবকয়টি বন্ধ রাখা হয়েছে। পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত তওবার দরজাটি খোলাই থাকবে।'

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, তোমরা যদি এত অধিক পরিমাণে

গুনাহ্ কর, যার স্তূপ আকাশের কিনারায় গিয়ে ঠেকে ; কিন্তু পরক্ষণে যদি স্বচ্ছ-পবিত্র মন নিয়ে আন্তরিকভাবে তওবা কর, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের তওবা কবূল করে নিবেন।

হাদীস শরীফে আছে, মানুষের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় হলো, আল্লাহ্র প্রতি প্রত্যাবর্তন ও অনুরাগ সহকারে আয়ু দীর্ঘ হওয়া।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ۔

'বনী আদম মাত্রই গুনাহ্গার ; কিন্তু উত্তম গুনাহ্গার সে-ই, যে তওবাকারী হয়।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একদা এক বান্দা গুনাহ্ করার পর অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে আল্লাহ্র দরবারে আরজ করলো, ইয়া আল্লাহ্! আমি গুনাহ্ করে ফেলেছি, আমাকে মাফ করে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ আমার বান্দার আমার প্রতি ঈমান রয়েছে—সে বিশ্বাস করে যে, আমি গুনাহ্ মাফ করে থাকি বা শাস্তি প্রদান করি। অতঃপর তাকে মাফ করে দিলেন। সেই বান্দা কিছুকাল গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার পর পুনরায় পাপে লিপ্ত হয়। ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে সে আবার আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইল। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ আমার বান্দা বিশ্বাস করে যে, আমি গুনাহ্ মাফ করি বা শাস্তি প্রদান করি। অতঃপর তাকে পুনরায় মাফ করে দিলেন। এভাবে কিছুকাল গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার পর সে পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেল এবং বললো ঃ ওগো মাওলা! আমি আবার গুনাহ্ করে ফেলেছি, আমাকে মাফ করে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ আমার বান্দা বিশ্বাস করে যে, তার একজন রব্ব আছে, যিনি গুনাহ্ মাফ করেন বা শাস্তি প্রদান করেন। অতঃপর তাকে পুনরায় মাফ করে দিলেন,—এখন যা ইচ্ছা সে করুক।

ইমাম মুনযির (রহঃ) বলেন ঃ 'এখন যা ইচ্ছা সে করুক কথাটির মর্ম হলো, বান্দার দ্বারা গুনাহ্ হয়ে যাওয়ার পর স্বচ্ছ মন ও পুনঃ গুনাহে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আন্তরিকভাবে তওবা ও এস্তেগফার করলে এই তওবা ও এস্তেগফার তার অতীতের গুনাহের জন্য কাফ্ফারাহ্

(প্রায়শ্চিত্য, ক্ষমা) হবে। অর্থাৎ সত্যিকার তওবা ও এস্তেগফারের জন্য আন্তরিক অনুশোচনা ও পুনরায় লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প থাকা চাই। অন্যথায় তা হবে মিথ্যুক ও কপট লোকদের তওবা, যা আল্লাহ্‌র কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, গুনাহ্ করার পর মুমিনের অন্তরে একটি কালো দাগ উদ্ভূত হয়। তওবার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার পর যদি কৃতপাপ পরিহার করে, তবে সেই দাগ মিটিয়ে দেওয়া হয়। আর যদি উত্তরোত্তর গুনাহে লিপ্ত হতে থাকে, তবে সেই দাগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে তার অন্তর মোহরযুক্ত করে দেয়। এ'কেই বলা হয় (মরিচা)। পবিত্র কুরআনে তা এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

"কখনও এরূপ নয়, বরং তাদের অন্তরসমূহে তাদের (গর্হিত) কার্য-কলাপের মরিচা ধরেছে।" (মুতাফ্‌ফিফীন ঃ ১৪)

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দার প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার কাছাকাছি হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার কৃত তওবা কবূল করেন।

হযরত মু'আয (রাযিঃ) বলেন ঃ একদা রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হাত ধরে এক মাইল পর্যন্ত চললেন, অতঃপর বললেনঃ ওহে মুআয! তোমাকে আমি নছীহত করি ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় কর, সত্য বল, ওয়াদা পূরণ কর, আমানত রক্ষা কর, খিয়ানত পরিত্যাগ কর, এতীমের প্রতি রহম কর, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার কর, গোস্বা হজম কর, নম্র কথা বল, সালামের ব্যাপক প্রচলন কর, ন্যায়পরায়ণ শাসকের অনুগত থাক, কুরআনের মর্ম গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা কর, আখেরাতের প্রতি অনুরাগী হও, ক্বেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের ভয় কর, পার্থিব আশা-আকাংখা কম কর, সর্বদা নেক আমলে মশগুল থাক। হে মুআয! আমি তোমাকে আরও নছীহত করি ঃ কোন মুসলমানকে কটু বাক্য বলো না, মিথ্যাকে সত্য, সত্যকে মিথ্যা বলো না, ন্যায়পরায়ণ শাসকের অবাধ্যতা করো না, আল্লাহ্‌র যমীনে ফেৎনা-ফাসাদ ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করো না।

হে মুআয! তুমি যেখানেই থাক না কেন, সেখানে বৃক্ষ-তরুলতাই হোক আর জড়পদার্থই হোক তুমি সর্বত্র সর্বদা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, গুনাহ্ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তওবা কর—গোপন গুনাহের জন্য গোপন তওবা আর প্রকাশ্য গোনাহের জন্য প্রকাশ্য তওবা।'

অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'অনুতাপকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রহমতের আশা করতে পারে, কিন্তু হঠকারী ব্যক্তি যেন তাঁর গজবের প্রতীক্ষায় থাকে। ওহে আল্লাহ্‌র বান্দারা! একদিন না একদিন আমলনামা অবশ্যই তোমাদের হাতে আসবে এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে প্রত্যেকেই তার ভাল-মন্দ প্রত্যক্ষ করে নিবে। কিন্তু পরিণাম তারই ভাল হবে, যার শেষাবস্থা ভাল হবে। দিবা-রাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত আপন গতিতে দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে, অতএব শীঘ্র আখেরাতের প্রস্তুতি নাও, আমলের দিকে বেগবান হও, টালবাহানা ও গাফলতিকে মোটেও প্রশ্রয় দিও না। কারণ, মৃত্যু এমন এক বস্তু, যা অকস্মাৎ এসে হাজির হয়ে যাবে, তখন তোমার করার কিছু থাকবে না। খবরদার! আল্লাহ্ পাকের অনন্ত ধৈর্য ও বাহ্যিক অবকাশ প্রদানে ধোকায় পড়ো না, আত্মবিস্মৃত হয়ো না। কারণ, দোযখের আগুন তোমা থেকে খুব বেশী দূরে নয়। অতঃপর হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ঃ

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

"যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ নেক কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে ; আর যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ বদ্ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।" (যিলযাল ঃ ৭,৮)

ত্ববরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.

"গুনাহ্ থেকে তওবাকারী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার মোটেই কোন গুনাহ্ নাই।"

বায়হাক্বী শরীফে আছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার পর পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হলো, সে যেন আল্লাহ্র সাথে ঠাট্টা করলো।'

ইব্নে হাব্বান ও হাকেম রেওয়ায়াত করেন, 'তওবার মূল, বিষয়ই হচ্ছে অন্তরের অনুতাপ ও অনুশোচনা।' অর্থাৎ হজ্জের জন্য আরাফার ময়দানে অবস্থান করা যেমন রুকন বা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বিষয়, তওবার জন্যে অনুতাপ-অনুশোচনা ঠিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্তরে এরূপ প্রতিক্রিয়ার অর্থ হলো স্বীয় পাপ ও কৃতকর্মের উপর আল্লাহ্র আযাব ও শাস্তির ভয় অন্তরে জাগরুক হওয়া। ধন-সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি বা মান-সম্মানের ঘাটতি হতে বাঁচার স্বার্থে অনুশোচনা করলে, তওবার মূল বিষয়ের অবিদ্যমানতার দরুন তা হবে সম্পূর্ণ অন্তসারশূন্য ও নিস্ফল প্রয়াস ; তওবা হিসাবে তা আল্লাহ্র কাছে মোটেও গণ্য হবে না।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَا عَلِمَ اللّٰهُ مِنْ عَبْدٍ نَدَامَةً عَلٰى ذَنْبٍ اِلَّا غَفَرَ لَهُ قَبْلَ اَنْ يَسْتَغْفِرَهُ مِنْهُ.

"যে বান্দা কৃতপাপের দরুন লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়,—যা প্রকৃত পক্ষে একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানতে পারেন—সেই বান্দা ক্ষমা প্রার্থনা করার পূর্বেই আল্লাহ্ পাক তাকে ক্ষমা করে দেন।"

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যার কুদরতের মুঠোয় আমার প্রাণ, তোমরা গুনাহ্ করবে এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে—এরূপ যদি না হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যারা গুনাহে লিপ্ত হবে এবং আল্লাহ্র কাছে তওবা করবে, অতঃপর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহ্র চাইতে অধিক গুণ-

কীর্তন ও প্রশংসা পছন্দকারী আর কেউ নয়, অতএব, তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ্র চাইতে অধিক আত্মমর্যাদাবান কেউ নয়, তাই তিনি অশ্লীল কার্যকলাপ হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ্র চাইতে অধিক উযর-আপত্তি ও অক্ষমতা কবূলকারী আর কেউ নয়, তাই তিনি কুরআন নাযিল করেছেন এবং রাসূল পাঠিয়েছেন।'

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, জুহাইনা গোত্রের একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়। সে অশ্লীল অপকর্মে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হওয়ায় তার অবৈধ গর্ভের সঞ্চার হয়েছিল। সে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হদ্দের (শরয়ী দণ্ডের) উপযুক্ত অপরাধ করেছি ; আমার উপর হদ্দ প্রয়োগ করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিভাবককে ডেকে উপস্থিত করে বললেন, তাকে যত্ন সহকারে তোমাদের তত্ত্বাবধানে রাখ, সন্তান খালাস হওয়ার পর আমার কাছে নিয়ে এসো। যথাসময়ে তাকে পুনরায় নিয়ে আসার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হলো। অতঃপর হুযূর (সাঃ) নিজে জানাযা পড়লেন। হযরত উমর (রাযিঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তার জানাযা পড়লেন, অথচ সে ব্যভিচার করেছে? হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ ওহে উমর! মহিলাটি এমন তওবা করেছে, যদি তা মদীনার প্রচুর সংখ্যক লোকদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয়, তাহলে সকলের জন্য তা যথেষ্ট হবে ; তুমি কি এরূপ তওবাকারী কখনও দেখেছ যে আল্লাহ্র জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছে?

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার নয় দু'বার নয়—এভাবে তিনি বলতে বলতে বললেন, সাতবারও নয় বরং আরও অধিকবার বলতে শুনেছি যে, বনী ইসরাঈল গোত্রের জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি অশ্লীল অপকর্মে অভ্যস্থ ছিল। একদা জনৈকা মহিলা তার নিকট হাজির হওয়ার পর তাকে ষাট দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদানান্তে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করলো। এভাবে লোকটি যখন স্বীয় মনোস্কামনা পূরণের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি ও উত্তেজনার আসনে বসলো, তখন স্ত্রীলোকটির সর্বশরীর থর থর করে

কাঁপতে আরম্ভ করলো এবং সে কাঁদতে লাগলো। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কাঁদছ কেন, তবে কি আমাকে তোমার অপছন্দ হচ্ছে। স্ত্রীলোকটি বললো ঃ না, বরং আমি জীবনে কোনদিন এহেন অশ্লীল কার্যে লিপ্ত হয় নাই, আজকে শুধুমাত্র ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এ কাজের জন্য বাধ্য হচ্ছি, এজন্যেই আমি বিচলিত, উৎকণ্ঠিত। লোকটি বললো, তোমার এহেন ভূখা-ফাকা ও দারিদ্রাবস্থায়ও তুমি এ থেকে বিরাগী আর এ কাজে তুমি জীবনেও কদর্যক্ত হও নাই ; এ দীনারগুলো তোমারই জন্য, আর আল্লাহ্‌র কসম, ভবিষ্যতে আমিও এ কাজে কোনদিন লিপ্ত হবো না। আল্লাহ্‌র মর্জী সেই রাত্রেই তার মৃত্যু হয়। লোকজন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে তার বাড়ীর দরজায় লেখা ঃ 'আল্লাহ্, তা'আলা এ লোকটিকে মাফ করে দিয়েছেন।'

হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত অতীতের এক সময়ে দু'টি জনপদ ছিল, একটি পুণ্যবান লোকদের, আরেকটি পাপী লোকদের। পাপী লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি স্বীয় জন্মভূমি ত্যাগ করে সৎলোকদের এলাকায় যাত্রা করলো। উদ্দেশ্য ছিল সৎভাবে জীবন-যাপন করবে। কিন্তু খোদার মর্জী পথিমধ্যে এক জায়গায় লোকটি মারা গেল। এখন তাকে কেন্দ্র করে রহমতের ফেরেশ্‌তা ও শয়তানের মধ্যে ঝগড়া শুরু হলো। শয়তান বললো ঃ খোদার কসম, সে কোনদিন আমার কথা অমান্য করে নাই। ফেরেশ্‌তা বললেন ঃ লোকটি বাড়ী হতে তওবা করে বের হয়েছে। করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা উভয়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিলেন ঃ তোমরা লোকটির মৃতদেহকে কেন্দ্র করে জরীপ করে দেখ দুই জনপদের মধ্যে সে কোন্‌টির অধিক নিকটবর্তী। দেখা গেল সে সৎলোদের এলাকার দিকে এক বিঘত পরিমাণ স্থান অধিক অতিক্রম করেছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন। আবার একথাও রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপন রহমতে সৎলোকদের এলাকাটিকে নিকটতম করে দিয়েছিলেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, পূর্বেকার যুগে এক ব্যক্তি ঘোর পাপী ছিল। বিনা অপরাধে সে নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করেছে। পরিশেষে নিজের কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করার ইচ্ছা করলো। সে জানতো না যে, আল্লাহ্‌র দরবারে তার তওবা কবূল

হবে কিনা। অতএব, সে একজন বুযুর্গ লোকের অনুসন্ধান করছিল। ইতিমধ্যে লোকমুখে একজন প্রসিদ্ধ আবেদ লোকের সন্ধান পেয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো ঃ আমি একজন ঘোর পাপী, বিনা দোষে নিরানব্বই জন নিরপরাধ লোককে আমি হত্যা করেছি, বলুন আমার তওবা কবূল হবে কিনা? দরবেশ লোকটি উত্তর করলো ঃ তোমার তওবা কবূল হবে না। এ কথা শুনে পাপী লোকটি হতাশ হয়ে এ আবেদ লোকটিকেও হত্যা করে নরহত্যার সংখ্যা একশত পূর্ণ করে নিলো। অতঃপর সে আরেকজন বিখ্যাত আলেমের সন্ধান জানতে পেরে তার খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আমি একজন ঘোর পাপী, আমার তওবা কবূল হবে কিনা? আলেম লোকটি উত্তর করলো ঃ 'তোমার তওবা কবূল হবে, কিন্তু তোমার আবাসভূমিই সর্ববিধ পাপের কারণ, তুমি অন্যত্র অমুক স্থানে চলে যাও, সেখানে বহু আবেদ লোক বাস করেন, তুমিও তাদের সাথে ইবাদতে মগ্ন হয়ে যাও।' সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থানের উদ্দেশে রওনা হলো। কিন্তু গন্তব্যস্থানে পৌছার পূর্বেই মধ্যপথে সে প্রাণ ত্যাগ করলো। এখন তাকে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাওয়া হবে কি দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, এ নিয়ে রহমতের ফেরেশ্‌তা ও আযাবের ফেরেশ্‌তার মধ্যে মতভেদ হতে লাগলো। প্রত্যেকে বলতে লাগলো ঃ এই লোক আমার আওতার মধ্যে। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে নির্দেশ আসলো, তোমরা পাপীর বাসগৃহ ও দরবেশদের আশ্রমের দূরত্ব জরীপ করে দেখ, মৃতদেহ থেকে কোন দিকের দূরত্ব অধিক। দেখা গেল, দরবেশদের আশ্রমের দিকে সে এক বিঘত পরিমাণ স্থান অধিক অতিক্রম করেছিল। নির্দেশ হলো তাকে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাও। তৎক্ষণাৎ রহমতের ফেরেশ্‌তা তাকে বেহেশ্‌তে নিয়ে গেল। অপর এক রেওয়ায়াতে প্রকাশ, আল্লাহ্ তা'আলা একদিকের যমীনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, দূরবর্তী হয়ে যাও এবং অপর দিকের যমীনকে নির্দেশ দিয়েছেন নিকটবর্তী হয়ে যাও। তারপর জরীপ করতে হুকুম করেছেন। ফলে, লোকটি দরবেশদের আশ্রমের দিকে নিকটবর্তী হয় এবং তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।'

অধ্যায় ঃ ৫৪

জুলুম-অত্যাচার

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۝

"আর যারা জুলুম করেছে, তারা অচিরেই জানতে পারবে, কেমন স্থানে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে।" (শু'আরা ঃ ২২৭)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

"বস্তুতঃ জুলুম কিয়ামত দিবসে বহু (শাস্তি ও) অন্ধকারের কারণ হবে।" তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنْ أَرْضٍ طَوَّقَهُ اللّٰهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি অন্যের এক বিঘৎ পরিমাণ যমীনও জুলুম করে দখল করে নিবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক যমীনের বোঝা বেড়িরূপে পরিয়ে দিবেন।"

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক (হাদীসে কুদসীতে) বলেন, অত্যাচারী ব্যক্তির উপর আমার ক্রোধ খুবই কঠিন (ও মারাত্মক) হবে, সে এমন ব্যক্তির উপর জুলুম করলো, যে আমাকে ছাড়া অপর কাউকে সাহায্যকারীরূপে পায় নাই।"

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ "তুমি যখন ক্ষমতার আসীনে সমাসীন থাক, তখন কারও উপর জুলুম করো না, কেননা জুলুমের পরিণাম নিশ্চিত অনুতাপ ও লজ্জা। কারও উপর জুলুম করে তুমি নিদ্রাভিভূত থাকলেও মজলূম কিন্তু বিনিদ্র রাতে তোমার বিরুদ্ধে আল্লাহ্র দরবারে

ফরিয়াদে মগ্ন আছে, আর অনন্ত জাগ্রত মহান আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন তা শুনছেন।

অপর একজন উপদেশ দিয়েছেন ঃ "পৃথিবীর বুকে কোন জালেমকে যখন তুমি দেখ যে, সে প্রচুর জুলুমে লিপ্ত রয়েছে, তখন তুমি তার বিচার যমানার (কুদ্রতের) হাতে ছেড়ে দাও ; অচিরেই সে এমন শাস্তি পেয়ে যাবে, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।"

আদর্শ পূর্বসূরীদের একজন বলেছেন, "তোমরা কমজোর-দুর্বলদের উপর জুলুম করো না, এতে তোমরা সবল হয়েও নিকৃষ্টতম গণ্য হবে।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, সরখাব (লাল রঙের হাঁস বিশেষ) পাখীও জালেমের জুলুমের ভয়ে তার ক্ষুদ্র গৃহে আত্মগোপন করে মৃত্যুবরণ করে।"

হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, যখন হাবাশা গমনকারী মুহাজির সাহাবীগণ সেখান থেকে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন আল্লাহ্র রসূল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন— হাবাশার কোন ঘটনা কি তোমরা আমাকে বলবে না? হযরত কুতাইবাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমাদের মধ্যে হযরত আলী (রাযিঃ)-ও ছিলেন ; জবাবে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেখানে একটি ঘটনা এই ঘটেছিল—আমরা উপস্থিত ছিলাম ; এমন সময় একজন বৃদ্ধা মহিলা মাথায় একটি মাটির কলসী নিয়ে পথ অতিক্রম করছিল, তখন একটি যুবক বৃদ্ধা মহিলাটিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। ফলে, মহিলাটি উপুড় হয়ে পড়ে গেল এবং তার কলসীটি ভেঙ্গে গেল। মহিলাটি মাটি থেকে উঠে যুবকের দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার দাম্ভিক আচরণের প্রায়শ্চিত্ত অচিরেই তুমি ভোগ করবে— যখন আল্লাহ্ তা'আলা বিচারের আসনে সমাসীন হবেন, পূববর্তী ও পরবর্তী সকল আদম-সন্তানকে একত্রিত করবেন, সকলের হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীয় কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে, তখন সেই কাল ক্বিয়ামতের দিবসে তোমার-আমার এ ফয়সালা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে নিবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "এ জাতি কিভাবে পাক-পবিত্র হবে, যাদের সবল লোকেরা দূর্বলদের উপর জুলুম করে, অথচ এর কোন বিচার-প্রতিকার করা হয় না।"

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

خَمْسَةٌ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اِنْ شَاءَ اَمْضٰى غَضَبَهُ عَلَيْهِمْ
فِي الدُّنْيَا وَاِلَّا تَوٰى بِهِمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَى النَّارِ اَمِيْرُ قَوْمٍ
يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ رَعِيَّتِهٖ وَ لَا يُنْصِفُهُمْ مِنْ نَفْسِهٖ وَ لَا يَدْفَعُ
الظُّلْمَ عَنْهُمْ وَ زَعِيْمُ قَوْمٍ يُطِيْعُوْنَهُ وَ لَا يُسَوِّى بَيْنَ الْقَوِىِّ
وَالضَّعِيْفِ وَيَتَكَلَّمُ بِالْهَوٰى وَرَجُلٌ لَا يَامُرُ اَهْلَهُ وَ وَلَدَهُ بِطَاعَةِ
اللّٰهِ وَلَا يُعَلِّمُهُمْ اَمْرَ دِيْنِهِمْ وَرَجُلٌ اِسْتَاجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَعْمَلَهُ وَلَمْ يُوَفِّهٖ
اَجْرَهُ وَرَجُلٌ ظَلَمَ امْرَاَةً فِيْ صَدَاقِهَا

"আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচ শ্রেণীর লোকের উপর রাগান্বিত ; ইচ্ছা করলে তিনি দুনিয়াতেই তাদের উপর আযাব-গজব নাযিল করবেন, অথবা পরকালে তাদেরকে দোযখের ভয়াবহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন ঃ

এক,— অত্যাচারী শাসক, যারা প্রজাদের কাছ থেকে অধিকার আদায় করে কিন্তু তাদের সাথে ইনসাফ ও ন্যায়-আচরণ করে না, তাদের উপর অপরের জুলুম-নির্যাতনেরও কোন প্রতিকার করে না।

দুই,— নেতৃস্থানীয় লোক, সাধারণ লোকজন তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ করে, কিন্তু সবল ও দুর্বলের মধ্যে তারা ভারসাম্য ও সত্যিকার ন্যায় আচরণ বজায় রাখে না বরং প্রবৃত্তির অনুসরণ ও ইন্দ্রিয়জ স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত থাকে।

তিন,— গৃহকর্তা বা অভিভাবক, যারা পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততিকে ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে না এবং দ্বীনি বিষয়াবলী শিক্ষা দেয় না।

চার,— যে ব্যক্তি শ্রমিক-মজদুরকে পুরাপুরিভাবে খাটিয়ে কাজ নেয়,

কিন্তু তাদের পূর্ণ পারিশ্রমিক দেয় না।

পাঁচ,— যে ব্যক্তি স্ত্রীর মহর পরিশোধের ব্যাপারে জুলুম করে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে সালাম (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন সমস্ত মখ্‌লূকাত সৃষ্টি করলেন, তখন তারা মাথা উঠিয়ে আল্লাহ্ তা'আলাকে জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহ্! আপনি কার সাথে আছেন? আল্লাহ্ বললেন, আমি মজলূমের সাথে আছি ; যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রাপ্য হক আদায় না করা হয়।

হযরত ওয়াহ্‌ব ইব্‌নে মুনাব্বিহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক অত্যাচারী ব্যক্তি একটি অতি মজবূত প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। একজন দরিদ্র বৃদ্ধা মহিলা এর পাশেই ক্ষুদ্র একটি ঘর বানিয়ে সেটিতে বসবাস করতে লাগলো। সেই অত্যাচারী ব্যক্তি একদিন অশ্বে আরোহণ করে তার প্রাসাদ পরিদর্শনের সময় বৃদ্ধার প্রাসাদটি তার নজরে পড়লে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলো— এটি এক দরিদ্র বৃদ্ধার ঘর। এ কথা জেনে সে ঘরটি ধ্বসিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলো। অতঃপর তা ধ্বসিয়ে দেওয়া হলো। বৃদ্ধা এসে এহেন অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলো, সেই অত্যাচারী বাদশাহ্ এ কাজটি করেছে। তৎক্ষণাৎ আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বৃদ্ধা বললো, আয় আল্লাহ্! আমি এখানে ছিলাম না, কিন্তু আপনি কোথায় ছিলেন? আল্লাহ্ হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে হুকুম দিলেন, অত্যাচারীর এ প্রাসাদটি তার উপরেই ধ্বসিয়ে দাও। সুতরাং তাই করা হলো এবং অত্যাচারী লোকটি এভাবে ধ্বংস হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে, জনৈক বর্‌মকী উজীর তার পুত্র সহকারে বন্দী হয়ে জেলখানায় আবদ্ধ হয়ে গেল। পুত্র জিজ্ঞাসা করলো, আব্বাজান! এতো প্রভাব ও সম্মান-প্রতিপত্তির পরও আমরা এরূপ লাঞ্ছিত হলাম—এর কারণ কি? পিতা বললো, বৎস! কোন মজলূমের বদ-দোআ রাতের অন্ধকারে ছিট্‌কে এসে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, আর আমরা গাফেল ছিলাম; কিন্তু অনন্ত আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন গাফেল ছিলেন না।

হযরত ইয়াযীদ ইব্‌নে হাকীম (রহঃ) বলেন, আমি আমার অন্তরে সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় অনুভব করি ঐ ব্যক্তির, যার উপর আমি জুলুম করে ফেলি, আল্লাহ্ ছাড়া যার কোন সাহায্যকারী নাই। সে এ কথা বলতে থাকবে যে,

আল্লাহ্‌র সাহায্যই আমার জন্য যথেষ্ট ; তোমার আমার মাঝে আল্লাহ্ রয়েছেন।

হযরত আবূ উমামাহ্ (রাযিঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন জালেম আসবে—সে যখন দোযখের উপর দিয়ে পুল অতিক্রম করতে থাকবে, তখন মজলূমের সাক্ষাৎ হবে। দুনিয়াতে মজলূমের উপর সে যে জুলুম করেছিল, সবই তার স্মরণ হবে। মজলূম ব্যক্তিরাও নিজ নিজ প্রাপ্য হক ওসূল করতে চাবে। তখন এই জালেম ও মজলূমের মাঝে তুমুল বিতর্ক চলতে থাকবে। পরিশেষে মজলূম ব্যক্তিরা জালেমদের সমস্ত নেকী নিয়ে নিবে। এতে যদি জালেমের নেকী শেষ হয়ে যায় এবং মজলূমের প্রাপ্য বাকী থাকে, তবে সেই পরিমাণ পাপের বোঝা মজলূমের নিকট থেকে জালেমের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। ফলে, জালেম দোযখের নিম্নতর গহ্বরে গিয়ে পৌছবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উনাইস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামতের দিন লোকদেরকে খালি পা, উলঙ্গ দেহ এবং খত্‌নাবিহীন অবস্থায় উঠানো হবে। তখন একজন আহ্বানকারী আওয়াজ দিবে—যা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলেই সমানভাবে শুনতে পাবে যে, আমি চরম প্রতিশোধ গ্রহণকারী বাদ্‌শাহ্, কোন বেহেশ্‌তী বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত একজন দোযখী ব্যক্তিও তার কাছে কোন জুলুমের বদলা দাবী করবে ; এমনকি একটি থাপড়ও পাওনা থাকলে তা পরিশোধ করতে হবে। অনুরূপভাবে, কোন দোযখী দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে না, যে পর্যন্ত তার কাছে কারও জুলুমের বদলা পাওনা থাকবে ; এমনকি একটি থাপড় হলেও তা পরিশোধ করতে হবে। বস্তুতঃ তোমার রব্ব কারও উপর জুলুম করেন না। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তখন কি অবস্থা হবে— আমরা উলঙ্গ পা, উলঙ্গ দেহ এবং খত্‌নাবিহীন অবস্থায় থাকবো? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেদিন নেকী–বদীর পূরা–পূরি বদলা দেওয়া হবে ; তোমাদের রব্ব কারও উপর জুলুম করবেন না।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে কাউকে একটি বেত্রাঘাতও করেছে, কিয়ামতের দিন এর প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

বর্ণিত আছে, সম্রাট কিস্‌রা তাঁর পুত্রকে আদব–কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন উস্তায নিযুক্ত করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে পুত্র যখন বেশ কিছু জ্ঞান–বিদ্যার অধিকারী হলো, তখন একদিন তাকে ডেকে তার কোনরূপ অন্যায়–অপরাধ ব্যতিরেকেই উস্তায্ খুব প্রহার করলেন। এতে সম্রাটের পুত্র রাগান্বিত হলো, কিন্তু এ রাগ অন্তরে গোপন করে রাখলো। পিতার মৃত্যুর পর যখন সে বাদশাহ্ হলো, তখন উস্তায্‌কে উপস্থিত করে জিজ্ঞাসা করলো—আপনি আমাকে অমুক দিন কোনরূপ অন্যায়–অপরাধ ব্যতিরেকেই এতো কঠোরভাবে প্রহার করেছিলেন কেন? উস্তায্ জবাব দিলেন হে বাদশাহ্, আপনি জ্ঞান–বিদ্যার অনুশীলনে তখন খুবই পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন ; এবং আমি তখনই জানতাম যে, পিতার পর একদিন আপনিই বাদশাহ্ হবেন। এজন্যে আমি তখনই আপনার উপলব্ধির মধ্যে এনে দিতে চেয়েছি যে, জুলুম–অত্যাচার ও প্রহৃত হওয়ার কষ্ট কি, যাতে পরবর্তীতে অন্য কারও উপর জুলুম থেকে আপনি বিরত থাকুন। সম্রাট এ উত্তর শুনে আনন্দিত হলেন এবং উস্তায্‌কে পুরস্কৃত করে বিদায় করলেন।

অধ্যায় ঃ ৫৫

এতীমের উপর জুলুম-অত্যাচারের নিষিদ্ধতা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ○

"নিশ্চয় যারা এতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে, তারা নিজেদের উদরে অগ্নি ছাড়া আর কিছুই পুরছে না, এবং অতি সত্বরই তারা জ্বলন্ত আগুণে প্রবেশ করবে।" (নিসা ঃ ১০)

হযরত ক্বাতাদাহ্ (রাযিঃ) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতটি গাত্ফান গোত্রের জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে; ব্যক্তিটি স্বীয় এতীম-নাবালেগ ভ্রাতুষ্পুত্রের অভিভাবক ছিল। অবশেষে তার সম্পত্তি থেকে সে নিজেও খেয়েছিল।

আয়াতে ব্যবহৃত 'জুলমান'-এর অর্থ হলো, জুলুমবশতঃ কিংবা জুলুমরত অবস্থায়। কাজেই বিনা জুলুমে অর্থাৎ অভিভাবক যদি তার প্রাপ্য হক গ্রহণ করতে চায়, তবে এতে আপত্তির কিছু নাই। বিস্তারিত শর্ত-শরায়েত ফেক্বাহ্র কিতাবসমূহে উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

"আর যে ব্যক্তি অভাবমুক্ত, সে নিজকে সম্পূর্ণ বিরত রাখবে, আর যে অভাবী, সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে।" (নিসা ঃ ৬)

অর্থাৎ প্রয়োজন পরিমাণ ব্যবহার করলে বৈধ হবে। অথবা করজ নিতে পারে, কিংবা পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। এ ছাড়া একেবারে

নিরুপায় অবস্থায় উপনীত হলে গ্রহণ করবে এবং স্বচ্ছলতার পর তা ফেরৎ দিবে। গ্রহণের পর স্বচ্ছল অবস্থা না হলে তার জন্য তা হালাল।

আল্লাহ্ তা'আলা এতীমের হক ও অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে অত্যন্ত জোর তাকীদ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ○

"আর এরূপ লোকদের ভয় করা উচিত যে, যদি তারা নিজেদের পশ্চাতে ছোট ছোট সন্তান ত্যাগ করে (মারা) যায়, তবে এদের জন্য তাদের (কেমন) ভাবনা হবে! সুতরাং তাদের উচিত—আল্লাহ্কে ভয় করা।"(নিসা ঃ ৯)

আশে-পাশের আয়াতদৃষ্টে উপরোক্ত আয়াতে এতীমের হক সংরক্ষণের উপরই তাকীদ করা হয়েছে বুঝা যায়। যদিও কেউ কেউ আয়াতখানিকে এক তৃতীয়াংশের অধিক ওসীয়তের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

যার অভিভাবকত্বে কোন এতীম রয়েছে, তার উচিত এতীমের সাথে সৎ ও সুন্দর ব্যবহার করা। এমনকি তাকে সম্বোধন করতেও যেন সুন্দরভাবে ডাকা হয়। নিজের সন্তানদেরকে যেভাবে আদর-সোহাগের সাথে ডাকা হয়, সেভাবে এতীমকেও যেন ডাকা হয়। নিজের সম্পদের হেফাযতের ব্যাপারে যেমন মনোযোগ ও সচেতনতা অবলম্বন করা হয়, এতীমের সম্পদের ব্যাপারেও ঠিক তেমনি করা চাই। এ ব্যাপারে যে যতটুকু নিষ্ঠা ও খাঁটিত্বের সাথে আমল করবে, কিয়ামতের দিন সে ঠিক সেই অনুপাতে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বদ্লা পাবে। খেয়াল রাখতে হবে— কেয়ামতের দিন তথা প্রতিদান দিবসের একমাত্র মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। সুতরাং সেদিন প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের ফল পাবে।

কারও মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর যদি কেউ তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবক নিযুক্ত হয় এবং সে এ দায়িত্বের উপর সময় অতিক্রম করে, অতঃপর অকস্মাৎ তার মৃত্যু এসে যায়, এমতাবস্থায় সে যদি অন্যের সম্পদ ও সন্তানের বেলায় সততা ও আমানতদারীর পরিচয় দিয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যক্তির সম্পদ ও সন্তানের হেফাযতের জন্য ঠিক তদ্রূপ

ব্যবস্থা করে দিবেন, যেরূপ সে অন্যের বেলায় করেছিল। পক্ষান্তরে, যদি সে অন্যের ক্ষতি করে থাকে, তবে নিজ সম্পদ ও সন্তানের বেলায় সেই প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হবে। অতএব, বুদ্ধিমান লোকের উচিত, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা। দ্বীন ও আখেরাতের ক্ষেত্রে তো ক্ষতি রয়েছেই, এসব ব্যাপারে অবহেলা করলে দুনিয়াতেই সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তাই, আপন তত্ত্বাবধানে লালিত এতীমদের সাথে এরূপ সদ্ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ করা চাই, যেরূপ নিজের সন্তানদের বেলায় তাদের এতীম হওয়ার পর কামনা করা হবে।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাঊদ আলাইহিস্ সালামের নিকট ওহী পাঠালেন ঃ "হে দাঊদ! এতীমের জন্য দয়ালু পিতা এবং বিধবার জন্য স্নেহশীল স্বামীর ন্যায় হয়ে যাও। আর স্মরণ রাখ, তুমি বীজ যেরূপ বপন করবে, ফল তদ্রূপই পাবে। অর্থাৎ তোমার আচরণ যেমন হবে, তোমার সাথে সেরূপ আচরণই করা হবে। এর কারণ হচ্ছে, মৃত্যু অতি অবশ্যম্ভাবী ; কাজেই তোমাকে একদিন মরতে হবে, তোমার সন্তান-সন্ততি এতীম হবে এবং তোমার স্ত্রী-ও বিধবা হবে।"

এতীমের মাল-সামান হেফাজত, তাদের প্রতি সুন্দর-সদ্ব্যবহার এবং তাদের উপর সর্ববিধ জুলুম-অত্যাচার থেকে বেঁচে থাকা সম্পর্কিত বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। বস্তুতঃ এ হাদীসসমূহ ঐসব আয়াতেরই অনুরূপ যেগুলোর মাধ্যমে লোকদেরকে এ বিষয়ে কঠোর সতর্ক করা হয়েছে এবং এতীমের প্রতি জুলুমের বিপদসঙ্কুল ও ধ্বংসাত্মক পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলিম শরীফ প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ "হে আবূ যর! আমি তোমাকে দুর্বল দেখছি ; তোমার জন্য আমি তাই পছন্দ করি, যা আমি নিজের জন্য করি। সুতরাং তুমি দু'টি লোকের নেতৃত্বের ভারও নিজ কাঁধে নিও না এবং এতীমের মালের তত্ত্বাবধায়ক হয়ো না।"

বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে আত্মরক্ষা করে চলো। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, সেগুলো কি? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইরশাদ করলেন, আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা, যাদু করা, না-হক কতল করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল খাওয়া........।

বায্যার রেওয়ায়াত করেছেন, বড় গোনাহ্ সাতটি ; আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা, কাউকে না-হক কতল করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল খাওয়া......।

হাকেম কর্তৃক সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, চার শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার হক রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না এবং (পরকালে) তাদেরকে কোন নেআমতের স্বাদ আস্বাদন করাবেন না। এক. মদ্যপানে অভ্যস্ত দুই. সূদখোর তিন. অন্যায়ভাবে এতীমের মাল ভক্ষণকারী চার. পিতামাতার অবাধ্য সন্তান।

সহীহ্ ইব্নে হাব্বানে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীদের প্রতি যে চিঠি হযরত আমর ইব্নে হাযমের হাতে পাঠিয়েছিলেন, তাতে এ কথাও লেখা ছিল যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বড় গোনাহ্ হচ্ছে, আল্লাহ্র সঙ্গে শির্ক করা, কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে না-হক হত্যা করা, তুমুল যুদ্ধ চলাকালে ময়দান ছেড়ে পলায়ন করা, পিতা-মাতার না-ফরমানী করা, সতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা, যাদু শিক্ষা করা, সূদ খাওয়া ও এতীমের মাল খাওয়া।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ এরূপ বিচার-বুদ্ধিহারা হয়ো না যে, লোকেরা যদি এহ্সান-উপকার করে, তাহলে তুমি এহ্সান-উপকার করবে, আর তারা যদি জুলুম করে, তাহলে তুমিও জুলুম করবে। বরং এরূপ চরিত্রের অধিকারী হও যে, লোকেরা এহ্সান করলে তুমিও এহ্সান করবে আর তারা জুলুম বা দুর্ব্যবহার করলেও তুমি তা করবে না।

আবূ ইয়ালা রেওয়ায়াত করেছেন যে, কেয়ামতের দিন একদল লোক হবে, তাদেরকে কবর থেকে এরূপ অবস্থায় বের করা হবে যে, তাদের মুখ-গহ্বর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা বের হতে থাকবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, তারা কারা? তিনি বললেন, তোমরা কি লক্ষ্য কর

নাই, আল্লাহ্ তা'আলা পাক কালামে কি বলেছেন? ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

"যারা অন্যায়ভাবে এতীমের মাল ভোগ করে, তারা অবশ্যই নিজেদের উদরে অগ্নি পুরে নিচ্ছে।" (নিসা ঃ ১০)

মেরাজ শরীফের হাদীসে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি হঠাৎ এমন কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদের উপর কিছু লোক মোতায়েন করে দেওয়া হয়েছে, এদের কয়েকজন তাদের মুখ–গহ্বর হা করিয়ে ধরে রাখে আর অবশিষ্টরা আগুনের পাথর এনে তাদের মুখের ভিতর ভরে দিচ্ছে, আর তা তাদের পিছন–পথ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। আমি (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিব্‌রাঈল! এসব লোক কারা? তিনি বললেন, যারা এতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের উদর আগুনের দ্বারা পূর্তি করে নিচ্ছে।

তফসীরে কুর্‌তুবী গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)–এর রেওয়ায়াত বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে রাত্রিতে আমাকে (বায়তুল–মুকাদ্দাস ও আকাশমণ্ডলীর মে'রাজ) সফর করানো হয়েছে, সে রাত্রিতে আমি দেখেছি যে, একদল লোকের ঠোঁট উটের ঠোঁটের মত ; তাদের উপর ফেরেশতা মোতায়েন করে দেওয়া হয়েছে। এঁরা তাদের ঠোঁটদ্বয় ফাঁক করে মুখের ভিতর আগুনের পাথর ঢেলে দিচ্ছে এবং তা তাঁদের পশ্চাৎপথ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিব্‌রাঈল! এসব লোক কারা? তিনি বললেন, এরা দুনিয়াতে এতীমের মাল জুলুম করে ভক্ষণ করতো।

অধ্যায় ঃ ৫৬

অহংকারের অপকারিতা

এ সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু অহংকার ও আত্মম্ভরিতার এ দুর্বৃত্তটি যেহেতু মানুষের দুশ্চরিত্রাবলীর মধ্যে অন্যতম এবং এর পরিণতি খুবই জঘন্য ও মারাত্মক, তাই এ বিষয়ের উপর পুনঃ আলোচনা আবশ্যক।

অভিশপ্ত ইবলীস থেকে সর্বপ্রথম যে গুনাহ্‌টি নিঃসৃত হয়েছিল তা এই অহংকার ও আত্মম্ভরিতার গুনাহ্। যার ফলশ্রুতিতে সে আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত হয়ে যমীন ও আসমানের প্রশস্ততাসম বেহেশ্‌ত থেকে বহিস্কৃত হয়ে দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

হাদীসে কুদ্‌সীতে আছে, বড়ত্ব আমার চাদর, মহত্ত্ব আমার ইযার (পোষাক বিশেষ)। অতএব, এতদুভয়ের যে কোন একটি নিয়ে যে ব্যক্তি আমার সাথে টানাটানিতে লিপ্ত হবে, আমি লা–পরওয়া তাকে টুক্‌রা–টুক্‌রা করে দিবো।

বর্ণিত আছে, অহংকারী–দাম্ভিকদেরকে মানবাকৃতি বজায় রেখে ক্ষুদ্র–ক্ষুদ্র পিপিলিকার আকারে হাশরের ময়দানে উত্থিত করা হবে। সর্বদিক থেকে তাদের উপর লাঞ্ছনার বান নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে, তাদেরকে দোযখীদের যখম ও ফোঁড়ার পুঁজ ও দুর্গন্ধময় রক্ত পান করানো হবে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ جَائِرٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তিন শ্রেণীর লোকদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি কোনরূপ (রহমতের) দৃষ্টিও করবেন না। অধিকন্তু তাদের জন্য থাকবে দোযখের মর্মন্তুদ শাস্তি। এক, বৃদ্ধ ব্যভিচারী, দুই, জালেম বাদশাহ্, তিন, দরিদ্র অহংকারী।

বর্ণিত আছে, একদা হযরত উমর (রাযিঃ) নিম্নের এই আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ

অতঃপর বললেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন— এক ব্যক্তি সৎকাজের নির্দেশ প্রদানের জন্য উদ্যত হলো, আর তাকে কতল করে দেওয়া হলো, আরেকজন উঠে বললো, কিহে, তোমরা সৎকাজের প্রতি আদেশদাতাকে কতল করে ফেললে? এবার একেও কতল করে দেওয়া হলো। বস্তুতঃ অহংকারই হচ্ছে এ ধরণের জঘন্যতম অপরাধের উৎস।

হযরত ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন যে, মানুষের পাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তাকে বলা হলো, আল্লাহ্কে ভয় কর, আর সে উত্তরে বললো, যাও, তুমি তোমার কাজ কর।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন, ডান হাতে খাও। উত্তরে সে বলেছে, এটা আমার দ্বারা হবে না। হুযূর বললেন, আচ্ছা, আর না হোক। বস্তুতঃ সে অহংকার ভরে ডান হাতে খেতে অস্বীকার করেছিল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে তার ডান হাত আর কখনও উঠাতে পারে নাই, অর্থাৎ তা অকেজো ও অবশ হয়ে যায়।

বর্ণিত আছে, হযরত সাবেত ইব্নে কায়স ইব্নে শাম্মাস (রাযিঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি স্বভাবগতভাবে রূপ-সৌন্দর্য পছন্দ করি এবং নিজে সাজ-সজ্জা গ্রহণ করে থাকি, এটা কি অহংকার? আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না এটা অহংকার নয়। বরং অহংকার হচ্ছে, হক ও সত্যকে অপছন্দ করা ; অস্বীকার করা এবং লোকদেরকে

তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, অথচ তারা তোমারই মত আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা অথবা তারা তোমার তুলনায় শ্রেষ্ঠও হতে পারে।

হযরত ওয়াহ্ব ইব্নে মুনাব্বেহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত মূসা (আঃ) যখন ফেরাউনকে বললেন, ঈমান আন ; তোমার রাজত্ব তোমার হাতেই থাকবে, তখন সে হামানের সাথে পরামর্শের কথা বলেছে। হামান তাকে পরামর্শ দিয়েছে—এতদিন তুমি প্রভু হিসাবে রয়েছ ; লোকেরা তোমার উপাসনা করেছে, এখন তুমি ঈমান আনবে ; ফলে তুমি হবে বান্দা এবং আরেক প্রভুর উপাসনা করতে হবে তোমাকে ; এটা ঠিক নয়। এতে ফেরাউন ঈমান আনা থেকে বিমুখ হয়ে গেল এবং তার অন্তরে হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসারীদের প্রতি ঘৃণা জন্মালো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিলেন।

কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ

"তারা বললো, এ কুরআন উভয় জনপদের (মক্কা ও তায়েফের) মধ্য হতে কোন প্রধান ব্যক্তির উপর কেন নাযিল করা হয় নাই?"

(যুখরুফ ঃ ৩১)

হযরত কাতাদাহ্ (রাযিঃ) বলেন, উক্ত আয়াতে তারা 'দুই জনপদের বড় মানুষদের' দ্বারা ওলীদ ইব্নে মুগীরা ও আবূ মাসঊদ সাকাফীকে বুঝিয়েছে। তারা দাবী করেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তুলনায় তারা দুজন অধিকতর প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী। তারা বলতো, এই এতীম বালককে কি করে আমাদের মধ্যে নবী হিসাবে প্রেরণ করা হলো? আল্লাহ্ পাক তাদের বক্তব্যের জওয়াব দিয়েছেন ঃ

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ط

"এরা কি আপনার রব্বের রহমতকে (স্বীয় মতানুযায়ী) বন্টন করতে চাচ্ছে?" (যুখরুফ ঃ ৩২) উপরন্তু তারা আরও আশ্চর্যান্বিত হবে— তারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর সেখানে যখন মসজিদে নববীর সুফ্ফায়

(আঙ্গিনায়) অবস্থানকারী দরিদ্রদেরকে দেখবে না, তখন তারা বলবে ঃ

مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ

"ব্যাপার কি? আমরা তাদেরকে দেখ্ছি না যাদেরকে নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে গণ্য করতাম।" (ছোয়াদ ঃ ৬২)

এক উক্তি অনুযায়ী তারা হযরত আম্মার, হযরত বেলাল, হযরত সুহাইব ও হযরত মিক্বদাদ (রাযিঃ)-কে উদ্দেশ্য করেছে।

হযরত ওয়াহ্ব (রাযিঃ) বলেছেন বস্তুতঃ ইল্মের তুলনায় হয় মেঘের সাথে, যা আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে। সুমিষ্ট ও স্বচ্ছ পানির বর্ষণ পেয়ে বৃক্ষরাজি প্রতিটি রগে রগে খুবই তৃপ্ত হয়ে পান করে। অতঃপর নিজ নিজ স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী সেই স্বচ্ছ ও মিষ্ট পানির ক্রিয়া গ্রহণ করে— তিক্ত বৃক্ষ তিক্ত ক্রিয়া গ্রহণ করে এবং তার তিক্ততা আরও বৃদ্ধি পায়, অনুরূপভাবে মিষ্ট বৃক্ষের মিষ্টতা বৃদ্ধি পায়। মূলতঃ ইল্মের ব্যাপারটিও ঠিক অনুরূপ। ইল্ম অন্বেষাকারী স্বীয় পরিশ্রম ও সাধনা অনুপাতে তা অর্জন করে। কিন্তু অহংকারী ব্যক্তির অহংকার এতে আরও বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, বিনয়ী ব্যক্তি ইল্ম অধ্যয়ন করে আরও বিনয়ী হয় এবং তার সৎগুণাবলী উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর কারণ হচ্ছে, যার উদ্দেশ্যই অহংকার ও নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা অথচ সে মূর্খ-জাহেল, এমতাবস্থায় ইল্মের নাগাল পেলে সে মূলতঃ অহংকার ও বড়াই করার আরও উপকরণ হাতে পেয়ে গেল। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্র প্রতি যার অন্তরে ভয় আছে, সে মূর্খ হলেও ইল্ম হাসিল করার পর বুঝে নিবে যে, আমার উপর আল্লাহ্ তা'আলার দলীল কায়েম হয়ে গেছে ; সুতরাং আর অন্যথা করা যাবে না। অতএব, সে পূর্বাপেক্ষা আল্লাহ্কে অধিক ভয় করবে এবং অধিক মাত্রায় নম্রতা ও বিনয় এখ্তিয়ার করবে।

হযরত আব্বাস (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত এক রেওয়ায়াতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ভবিষ্যতে এমন এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু হুল্কূমের (গলা) নীচে তা পৌছবে না। তারা বলবে, আমরা কুরআন পড়েছি, অধ্যয়ন করেছি আমাদের চেয়ে বড় বিজ্ঞ ও আলেম কারা? অতঃপর সাথীদের প্রতি লক্ষ্য

করে বললেন, এসব লোক এ উম্মতের মধ্য থেকেই হবে। বস্তুতঃ এরাই হবে দোযখের ইন্ধন।

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, অত্যাচারী ও অহংকারী আলেম হয়ো না। এতে তোমার মূর্খতা দূর হবে না ; এরূপ ইল্ম তোমার কোন উপকারে আসবে না।

বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এক ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়েছিল। কিছুদিন পর লোকটি হুযূরের দরবারে উপস্থিত হলে সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা সেদিন যে লোকটির প্রশংসা করেছিলাম, তিনি উপস্থিত হয়েছেন। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তার চেহারায় শয়তানের প্রভাব লক্ষ্য করছি। লোকটি সালাম করে হুযূরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। হুযূর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সত্যি করে বল, তোমার মনে কি এ কথা এসেছে যে, এসব লোকের মধ্যে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নাই? লোকটি বললো, হাঁ।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়্যাতের নূর-দৃষ্টিতে তার অন্তরের গোপন বিষয়টি দিব্যি উপলব্ধি করে নিয়েছেন, যা তার চেহারায় তিনি প্রত্যক্ষ করছিলেন।

হারস ইব্নে জায' যুবাইদী (রাযিঃ) বলেছেন, জ্ঞানী-গুণী ও আলেমদের মধ্যে যারা হাসিমুখে পেশ আসেন, আমি তাঁদেরকে বড় পছন্দ করি। আর যারা এমন যে, তুমি তাদের সাথে হাসিমুখে খোলা মনে পেশ আস্ছো; কিন্তু তারা ভ্রূকুঞ্চিত করে সংকীর্ণ মন নিয়ে সাক্ষাৎ করে। বস্তুতঃ তারা নিজেদের জ্ঞান-গরিমার উপর গর্ব-অহংকারে নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে এসব লোকের আধিক্য থেকে হেফাজত করুন।

বর্ণিত আছে, হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে এক ব্যক্তির উপর কটু বাক্য প্রয়োগ করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, ওহে কৃষ্ণাঙ্গিনীর পুত্র। এ কথা শুনে তিনি বললেন, হে আবূ যর! অনেক বেশী বলা হয়ে গেছে ; কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের (শুধু বর্ণ-তারতম্যের কারণে) কোনই প্রাধান্য নাই। হযরত আবূ যর গেফারী বলেন, আমি মাটিতে শুয়ে পড়লাম এবং লোকটিকে

বললাম তুমি উঠ এবং আমার গণ্ডদেশ পদদলন কর।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন যে, সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা প্রিয় আর কেউ ছিল না। এতসত্ত্বেও তাঁকে দেখে সাহাবায়ে কেরাম দাঁড়াতেন না। কেননা, তাঁরা জানতেন যে, তিনি তা অপছন্দ করেন। অনেক সময় দেখা গেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে পথ চলাকালে বলতেন, তোমরা আগে আগে চল। এ কথা বলে তিনি নিজে সকলের পিছনে হাঁটতেন। এ দ্বারা সুন্দর চলন-নীতি শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য হতে পারে কিংবা নিজের নফ্সকে শয়তানী ওস্ওসা থেকে হেফাজত করাও হতে পারে।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেছেন, যদি কেউ কোন দোযখী ব্যক্তিকে দেখ্তে চায়, তাহলে সে যেন ঐ ব্যক্তিকে দেখে যে নিজে বসে রয়েছে, অথচ তার সম্মুখে অন্যান্য লোকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে (অর্থাৎ যা দাম্ভিক ও অহংকারী লোকদের অভ্যাস)

অধ্যায় ঃ ৫৭

বিনয় ও অল্পেতুষ্টির বয়ান

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهٗ

অর্থাৎ, "ক্ষমা করলে আল্লাহ্ পাক ক্ষমাকারী বান্দার সম্মান ও ক্ষমতা বাড়িয়ে দেন, আল্লাহ্র জন্যে বিনয় ও নম্র-ভদ্রের আচরণ করলে আল্লাহ্ পাক তাকে উন্নত করেন এবং উচ্চ পদ-মর্যাদা দান করেন।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন যে, সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে অসহায় ও উপায়হীন না হয়েও বিনয় অবলম্বন করে, সঞ্চিত সম্পদ গুনাহের কাজে ব্যয় না করে বৈধ কাজে ব্যয় করে, দরিদ্র ও দুর্বলদের প্রতি দয়া করে এবং জ্ঞানী-প্রজ্ঞাবান আলেম ও ফকীহ্দের সাহচর্য অবলম্বন করে।

বর্ণিত আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে এক গৃহে আহার করছিলেন। এমন সময় একজন পঙ্গু ভিক্ষুক (যে সাধারণতঃ ঘৃণাযোগ্য) এসে দরজায় আওয়াজ দিল। তিনি তাকে গৃহাভ্যন্তরে আসার অনুমতি দিলেন। অতঃপর তাকে আপন উরুতে বসিয়ে খেতে দিলেন। এতে জনৈক কুরাইশী ব্যক্তির মনে ঘৃণার উদ্রেক হলো। এতদ্দৃষ্টে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার রব্ব আমাকে দু'টির যেকোন একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন—তাঁর বান্দা ও রাসূল হবো, অথবা বাদশাহ্ নবী হবো। এতদুভয়ের মধ্যে আমি কোন্টি গ্রহণ করবো, তা স্থির করতে না পেরে আমার একান্ত বন্ধু হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর প্রতি মাথা উচিয়ে তাকালাম। তিনি বললেন, প্রভুর সান্নিধ্যে

আপনি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করুন। অতঃপর আমি তাই গ্রহণ করে নিয়েছি।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)–এর নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, আমি সে ব্যক্তির নামায কবূল করে থাকি, যে আমার বড়ত্বের সম্মুখে বিনয় অবলম্বন করে, মখ্লূকের মোকাবেলায় নিজকে বড় মনে না করে এবং সর্বদা অন্তরে আমার ভীতি জাগরুক রাখে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْكَرَمُ التَّقْوٰى وَالشَّرَفُ التَّوَاضُعُ وَالْيَقِيْنُ الْغِنٰى

"ইযযত ও সম্মান নিহিত রয়েছে তাক্ওয়া–পরহেযগারীর মধ্যে, মর্যাদা ও কৌলিন্য নিহিত রয়েছে বিনয় ও নম্রতার মধ্যে এবং অমুখাপেক্ষিতা নিহিত রয়েছে একীন তথা দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যে।"

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, দুনিয়াতে যারা বিনয় অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য সুসংবাদ যে, ক্বেয়ামতের দিন তারা উন্নত মঞ্চের অধিকারী হবে, আর যারা মানুষের মধ্যে আত্মার সংশোধনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে তাদের জন্য সুসংবাদ যে, তারা ক্বেয়ামতের দিন জান্নাতুল–ফেরদাউসের অধিকারী হবে।

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, আমার কাছে এ হাদীস পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে ইসলাম গ্রহণের তওফীক দান করেন, অতঃপর ইসলামই হয় তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, আর সে এমন কোন কাজে জীবন কাটায় যার মধ্যে অবৈধ কিছু নাই ; এরই মাধ্যমে সে জীবিকা পায়, তার মধ্যে যদি বিনয় ও নম্র স্বভাব থাকে, তবে সে আল্লাহ্ তা'আলার নির্বাচিত বিশেষ বান্দা।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اَرْبَعٌ لَا يُعْطِيْهِنَّ اللّٰهُ اِلَّا مَنْ اَحَبَّ الصَّمْتَ وَهُوَ اَوَّلُ

الْعِبَادَةِ وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللّٰهِ وَالتَّوَاضُعُ وَالزُّهْدُ فِى الدُّنْيَا۔

"চারটি সৎস্বভাব আল্লাহ্ পাক তাকেই দান করেন, যাকে তিনি ভালবাসেন এক. চুপ থাকার অভ্যাস (অর্থাৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা না বলা), দুই. আল্লাহ্র উপর ভরসা করা, তিন. বিনয় অবলম্বন করা, চার. দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হওয়া।"

বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহারে রত ছিলেন। এমন সময় বসন্ত রোগে আক্রান্ত কৃষ্ণ বর্ণের একজন লোক—যার শরীরের চর্ম বিরূপ হয়ে গিয়েছিল, যার কাছেই সে যেতো, তাকে দূর দূর করে সরিয়ে দিতো—রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলো। তিনি তাকে নিজের কাছে বসিয়ে নিলেন।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমার বড় পছন্দ হয় ঐ সব লোকদেরকে যারা হাতে কিছু বহন করে উপার্জন করে, তা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এবং এভাবে আপন স্বভাব থেকে অহংকার দূর করার প্রয়াস চালায়।

একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি হলো যে, তোমাদের মধ্যে ইবাদতের কোন স্বাদ বা মিষ্টতা লক্ষ্য করি না? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইবাদতের স্বাদ ও মিষ্টতা কি? তিনি বললেন ঃ বিনম্র স্বভাব।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

اِذَا رَأَيْتُمُ الْمُتَوَاضِعِيْنَ مِنْ اُمَّتِىْ فَتَوَاضَعُوْا لَهُمْ وَاِذَا رَأَيْتُمُ الْمُتَكَبِّرِيْنَ فَتَكَبَّرُوْا عَلَيْهِمْ فَاِنَّ ذٰلِكَ مَذَلَّةٌ لَهُمْ وَصَغَارٌ

"আমার উম্মতের মধ্যে যখন তোমরা বিনয়ী লোকদের সাক্ষাৎ পাও, তখন তোমরাও তাদের সাথে বিনয়সুলভ আচরণ কর, আর যখন অহংকারী–

দাম্ভিক লোকদেরকে দেখ, তখন তাদেরকে (বাহ্যতঃ) অহংকার প্রদর্শন কর ; এটা তাদের অপমান ও শাস্তি।"

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী উপদেশদাতা কি চমৎকার উপদেশ দিয়েছেন ঃ বিনয়ী হও, তা'হলে মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন হবে। তারকার প্রতিবিম্ব যদিও দ্রষ্টার দৃষ্টিতে পানির নীচে দেখায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার অবস্থান খুবই উচে।

ধোয়ার ন্যায় হয়ো না, শূন্যমার্গের উঁচুতে তাকে উড়ন্ত দেখায়, কিন্তু তার অবস্থান হয় নীচ ও হীন।

অল্পেতুষ্টির কল্যাণ ও ফযীলত ঃ

ইতিপূর্বে স্বতন্ত্র এক অধ্যায়ে অল্পেতুষ্টির কল্যাণ ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

عِزُّ الْمُؤْمِنِ اِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ

"মুমিনের ইয্যত-সম্ভ্রম এরই মধ্যে নিহিত যে, সে কারও মুখাপেক্ষী হবে না। অল্পে তুষ্ট থাকবে।"

এই অল্পেতুষ্টির মধ্যেই রয়েছে নিজ স্বাধীনতা ও সম্মান। এজন্যেই জনৈক জ্ঞানীর উক্তি রয়েছে যে, তুমি যে কোন (উন্নত) ব্যক্তির মুখাপেক্ষিতা হতে নিজেকে বাঁচাবে, তুমি (অচিরেই) তার সমকক্ষ হয়ে যাবে, আর তুমি যারই সাথে দয়া ও অনুগ্রহের আচরণ করবে, তুমি তার আমীর হয়ে যাবে। যে অল্পের দ্বারা তোমার প্রয়োজন মিটে যায়, তা সেই প্রাচুর্য অপেক্ষা বহুগুণ শ্রেষ্ঠ যে তোমাকে খোদার অবাধ্যতার দিকে ঠেলে দেয়।

এক বুযুর্গ বলেছেন যে, আমার অভিজ্ঞতায় প্রাচুর্যকে আমি অল্পেতুষ্টির তুলনায় শ্রেষ্ঠ পাই নাই। এমনিভাবে দারিদ্র্যকে লালসার তুলনায় কঠিন পাই নাই। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো উচ্চারণ করলেন, যার অর্থ হচ্ছে ঃ

* অল্পেতুষ্টির অভ্যাসই আমাকে ইয্যতের লেবাস পরিয়েছে। এমন কোন প্রাচুর্য আছে কি যা অল্পেতুষ্টির চেয়ে বেশী ইয্যত দিতে পারে?

* ধৈর্য্য ও সবরই হচ্ছে তোমার মূল পূঁজি, এরপর তাকওয়াই হচ্ছে অমূল্য সম্পদ।

* মুহূর্তকাল সবর করে দেখ, বন্ধুর মুখাপেক্ষিতা হতে নিস্কৃতি পাবে। আরও অধিককাল সবর করলে বেহেশ্‌তে স্থান পেয়ে যাবে।

অপর এক কবি বলেছেন ঃ

* সত্যিকার প্রয়োজন যতটুকু, তোমার আত্মাকে তা দিতে কুণ্ঠিত হয়ো না। অন্যথায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে দাবী করবে।

* তোমার এই দীর্ঘ জীবনটি অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু আসল সময়ের জন্য তুমি কোনই প্রস্তুতি গ্রহণ করলে না।

আরও একজন বলেছেন ঃ

* তোমার রিযিক যদি তোমা থেকে দূরে সরে যায়, তাহলে তুমি সবর কর এবং যতটুকু তোমার আছে, তা নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থাক।

* কোন কিছু হাসিল করা বা পাওয়ার জন্যে এমনভাবে লেগে যেয়ো না যে, তুমি প্রাণ উৎসর্গ করে দিবে, বরং এ কথা বিশ্বাস রেখ যে, নসীবে (লেখা) থাকলে তা অবশ্যই তুমি পাবে।

অপর একজন বলেন ঃ

* নীচ ও অসভ্য লোকদের অসহযোগিতা যদি তোমাকে তৃষ্ণার্ত করে তোলে, তাহলে অল্পে তুষ্টির চরিত্রকে আপন করে নাও ; এতে তুমি তৃপ্তি লাভ করবে।

* তুমি এমন সাধক পুরুষ হওয়ার চেষ্টা কর যে, তোমার পা যদি থাকে মাটির নীচে, তাহলে তোমার হিম্মত ও সৎসাহসের শিরটি যেন থাকে সর্বোচ্চ নক্ষত্রসম উঁচু অবস্থানে।

আরও একজন উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

* ওহে রিযিকের অন্বেষণকারী! তুমি জীবনের এত শক্তি ব্যয় করে রিযিকের তালাশে ব্যস্ত? হায় আফসূস! তুমি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিলের মধ্যে পড়ে রয়েছ।

* প্রচণ্ড শক্তিধর সিংহ তার প্রবল প্রতিপত্তি সত্ত্বেও পশুর মৃতদেহের

উপরই রাজত্ব করে, আর নগণ্য দুর্বল মৌমাছির রাজত্ব চলে মূল্যবান মৌচাকের উপর।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আমল ছিল–কোন বিপদের সম্মুখীন হলে তিনি ঘরের সকলকে বলতেন, তোমরা উঠ এবং নামাযে রত হয়ে যাও। তিনি আরও বলতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এরূপ হুকুম করেছেন। অতঃপর এ আয়াত তেলাওয়াত করতেন ঃ

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

"আপনি আপনার সংশ্লিষ্টদেরকে নামাযের আদেশ করতে থাকুন এবং নিজেও এর পাবন্দ থাকুন।" (তোয়াহা ঃ ১৩২)

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানীর উপদেশ হচ্ছে ঃ

* দুনিয়া এবং দুনিয়ার চাকচিক্যের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। প্রাচুর্য ও লালসার ধোকায় পতিত হয়ো না।

* অনন্ত দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য যতটুকু নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তুমি সেটুকুর উপর রাজী হয়ে যাও। বস্তুতঃ অল্পেতুষ্টি এমন এক সম্পদ যা কোনদিন শেষ হয় না।

* দুনিয়ার আরাম–আয়েশের যাবতীয় সাজ–সামানই অহেতুক ; তাই এসব কিছু তুমি ত্যাগ কর। কেয়ামতের ময়দানে এগুলো তোমার কোনই উপকারে আসবে না।

আরও একজনের উপদেশ হচ্ছে ঃ

* যৎকিঞ্চিৎ যতটুকুই তোমার ভাগ্যে জুটে, ততটুকু নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থাক। কেননা, তোমার–আমার রব্ব একটি ক্ষুদ্র পিপিলিকাকেও ভুলেন না।

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন ঃ

* সুন্দর–শোভন ও আকর্ষণীয় পোষাক পরিধানের মধ্যেই ইয্যত–সম্মান নিহিত নয়। কেননা, সৌন্দর্য ও শোভা বর্ধনের ধ্যান–খেয়ালে যারা মত্ত থাকে, পরিণতিতে তারা দুনিয়ার মোহগ্রস্ত হয়ে দ্বীন–ধর্মের ব্যাপারে বেপরওয়া হয়ে যায় ; এসব লোক আত্মাভিমান থেকে খুব কমই রক্ষা পায়।

আরবী কবি বলেছেন, যার অর্থ হচ্ছে ঃ

* দুনিয়ার অংশ থেকে প্রাপ্য হিসাবে আমি আমার জন্য দারিদ্র্যসুলভ সামান্য খাদ্য এবং একটি চুগাকেই (পোষাক বিশেষ) যথেষ্ট মনে করে নিয়েছি ; অন্তরে এর অতিরিক্ত কোন বাসনাই আমি পোষণ করি না।

* কারণ, আমি দুনিয়াকে উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করেছি। দেখেছি যে, এর কোন স্থায়িত্ব নাই। অতএব, দুনিয়াও যেমন অতি ক্ষণস্থায়ী, আমার জীবনও তাই।

অধ্যায় ঃ ৫৮

দুনিয়ার ধোকা ও প্রতারণার বয়ান

দুনিয়ার সমগ্র অবস্থা মাত্র দু'ভাগে বিভক্ত। হয় আরাম-আয়েশের অবস্থা হবে, না হয় কষ্ট-ক্লেশের অবস্থা হবে। তাই, এ দুনিয়া সমগ্র জগতবাসীর অনুকূল নয়। বরং, সে এক এক সময় এক এক রূপ ধারণ করে ; একচ্ছত্র ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলা যখন যেরূপ ইচ্ছা করেন, দুনিয়ার হালাত ও অবস্থায় তেমনি পরিবর্তন আসতে থাকে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَ لَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ۝ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ط

"তারা সর্বদাই মতবিরোধ করতে থাকবে, কিন্তু যার প্রতি আপনার রব্বের অনুগ্রহ হয়।" (হূদ ঃ ১১৯)

কোন কোন মুফাস্‌সির বলেছেন, রুজি-রোজগারের ব্যাপারে তারতম্য ও বিভিন্নতা হয়। যেমন, কখনও অভাব কখনও সুখ ও প্রাচুর্য। এজন্যেই কর্তব্য হচ্ছে, যদি দুনিয়া অনুকূল থাকে, তাহলে পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও শোকর আদায় করা এবং নেক কাজে মগ্নতার মাধ্যমে সর্বক্ষণ তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করা। কেননা, প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র তিনিই হচ্ছেন সমস্ত দুঃখীর অভাব-অনটন দূরকারী ও আশ্রয়দাতা। সেইসঙ্গে সদা সতর্ক থাকা যে, দুনিয়ার ধোকা ও প্রতারণার শিকার যেন হতে না হয়। পবিত্র কুরআনের এ আয়াতখানি খুবই যথেষ্ট ঃ

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝

"অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং ঐ প্রতারক (শয়তানও) যেন তোমাদেরকে প্রতারিত করতে না পারে।"

(লুকমান ঃ ৩৩)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَ لٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ

"কিন্তু (তোমাদের অবস্থা ছিল যে,) তোমরা নিজেদেরকে গোম্‌রাহীতে আবদ্ধ রেখেছিলে, আর তোমরা অপেক্ষা করছিলে এবং তোমরা সন্দীহান ছিলে, বরং তোমাদের অযথা আকাংখাসমূহ তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল।" (হাদীদ ঃ ১৪)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْاَحْمَقُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ الْاَمَانِيَّ

"প্রকৃত বুদ্ধিমান সে, যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেয় ; আমল-আখলাক ও ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হয়ে যায়। আর আহ্‌মক হচ্ছে সে, যে নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে, অথচ আল্লাহ্‌র কাছে বহু কিছু পেতে আশাবাদী থাকে।"

জনৈক আরবী কবি বলেছেন ঃ

* দুনিয়ার সামান্যতম সম্পদ ও উল্লাসে যে এর প্রশংসা করে, অচিরেই সে দুনিয়ার প্রতি অভাবের অভিযোগ আনবে ও ভর্ৎসনা করবে।

* দুনিয়া যখন কারও থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন সে আক্ষেপ করতে থাকে, কিন্তু এই দুনিয়াই যখন কারও লাভ হয়, তখন তার দুর্দশা ও ভোগান্তির শেষ থাকে না।

অপর একজন বলেছেন ঃ

* আল্লাহ্‌র কসম, দুনিয়ার সমগ্র সম্পদও যদি কারও জন্যে চিরস্থায়ীভাবে হাসিল হয় এবং নিরঙ্কুশ স্বচ্ছল জীবন সে অতিবাহিত করে, তবুও কোন অভিজাত ভদ্রের পক্ষে (মোহে পড়ে) দুনিয়ার জন্য নিজকে সামান্যতম লাঞ্ছিত করা উচিত হবে না। অথচ এ দুনিয়া সম্পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী ; আগামীকল্যই এর ধ্বংস অনিবার্য।

ইব্‌নে বাস্‌সাম বলেন ঃ

* ধিক দুনিয়ার উপর ও দুনিয়ামুখী জীবনের উপর ; এ দুনিয়া সৃষ্টিই হয়েছে কেবল দুঃখ-দুর্দশা ও ভোগান্তির জন্যেই।

* কি বাদশাহ্‌ কি সাধারণ লোক কারও থেকে দুনিয়ার অস্বস্তি এক মুহূর্তের জন্যেই খতম হয় না।

* দুনিয়া এবং দুনিয়ার অবস্থার উপর বিস্মিত হই যে, সে নিজে মানুষের শত্রু, অথচ মানুষ তার প্রেমিক-পাগল।

অপর এক কবি বলেন ঃ

* দুনিয়াকে জিজ্ঞাসা কর—রোম-ইরানের সম্রাট (কায়সার ও কিস্‌রা), তাদের বিরাট বিশাল অট্টালিকা এবং এগুলো উপভোগকারীদের সাথে সে কি আচরণ করেছে? সেকি তাদেরকে বিক্ষিপ্ত ও পৃথক পৃথক করে দেয় নাই? বস্তুতঃ সে বোকা বুদ্ধিমান নির্বিশেষে সকলকেই ধ্বংস করে ছেড়েছে।

কথিত আছে, জনৈক মরুচারী বেদুঈন লোক একটি গোত্রের নিকট অবতরণ করে। গোত্রের লোকজন তাকে খাওয়া-দাওয়া করিয়েছে। অতঃপর লোকটি একটি তাঁবুর ছায়াতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। লোকেরা যখন তাঁবু সরিয়ে নিলো, তখন রৌদ্রের তাপে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সজাগ হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করার সময় সে বলেছে ঃ

* এতে কোন সন্দেহ নাই যে, দুনিয়া একটি গৃহের ছায়ার মত ; একদিন এ ছায়া অবশ্যই খতম হয়ে যাবে।

* সতর্ক হয়ে যাও, দুনিয়া অতি অল্প সময়ের আরামস্থল ; যেখানে পথিক মুসাফির কিছুক্ষণ অবস্থান করে, অতঃপর তা ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

জনৈক জ্ঞানবৃদ্ধ নিজ সঙ্গীকে বলেছিলেন, দ্বীনের আহ্‌বাহক দ্বীনের প্রতি তোমাকে ডাক দিয়েছে, দুনিয়া তোমার ডাকে সাড়া দিতে অপারগতা ঘোষণা করে দিয়েছে ; বড়ই অপরাধী হবে তুমি ; এরপরেও যদি ঈমান ও একীনকে বরবাদ করে ফেল এবং নেক আমল না কর।

হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য

ইল্‌মই যথেষ্ট এবং প্রতারিত হয়ে খোদা-বিমুখ হওয়ার জন্য মুর্খতাই যথেষ্ট।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ الدُّنْيَا وَسُرَّ بِهَا ذَهَبَ خَوْفُ الْاٰخِرَةِ مِنْ قَلْبِهٖ

"যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে এবং দুনিয়ার দ্বারা আনন্দিত হয়, তার অন্তর থেকে আখেরাতের ভয় দূর হয়ে যায়।"

এক বুযুর্গ বলেছেন, দুনিয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে যে যতটুকু দুঃখ ও আক্ষেপ করবে, আখেরাতে সেই অনুপাতে তার হিসাব হবে। এমনিভাবে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার সম্পদের উপর আনন্দ-উল্লাস করবে, আখেরাতে সেই অনুপাতেই তার হিসাব হবে। আজকাল স্পষ্ট হারাম বিষয় সম্পর্কেও তোমরা নির্দ্বিধায় বলে থাক, এগুলো ব্যবহারে কোন দোষ নাই; অথচ আদর্শ পূর্বপুরুষেরা হালাল বিষয়াবলীর ব্যাপারেও কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতেন, আর হারাম বস্তু তো তাদের দৃষ্টিতে হলাহল-বিষতুল্য ছিল।

হযরত উমর ইব্‌নে আব্দুল আযীয (রহঃ) অনেক সময় মিসআর ইব্‌নে কেরামের নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করতেন ঃ

نَهَارُكَ يَا مَغْرُوْرُ نَوْمٌ وَغَفْلَةٌ

وَلَيْلُكَ نَوْمٌ وَالرَّدٰى لَكَ لَازِمٌ

ওহে ধোকা ও প্রতারণার শিকার! তোমার জীবনের দিনগুলোও নিদ্রা ও অবহেলায় কাটিয়ে দিচ্ছ, আর রাতের নিদ্রা তো স্বভাবতঃ রয়েছেই।এ-ই যদি হয় অবস্থা, তবে জেনে রাখ, তোমার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

يَغُرُّكَ مَا يَفْنٰى وَتَفْرَحُ بِالْمُنٰى

كَمَا غَرَّ بِاللَّذَّاتِ فِى النَّوْمِ حَالِمٌ

ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষয়িষ্ণু এই দুনিয়া তোমাকে ধোকায় ফেলে রেখেছে, কামনা-বাসনা ও কল্পনায় তুমি আনন্দে মেতে রয়েছে। তোমার এ আনন্দ-উল্লাস নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির স্বপ্নের আনন্দের চেয়ে অধিক কিছু নয়।

شُغْلُكَ فِيهَا سَوْفَ يُكْرِهُ غِبُّهُ

كَذٰلِكَ فِى الدُّنْيَا تَعِيشُ الْبَهَائِمُ

খোদাবিমুখী উল্লাসময় এই মত্ততা অচিরেই তোমাকে ত্যাগ করতে হবে, তখন তোমার জন্য তা খুবই অসহনীয় হবে। বস্তুতঃ দুনিয়াতে চতুষ্পদ জন্তুরাই এরূপ জীবনাতিবাহন করে থাকে।

অধ্যায় ঃ ৫৯

দুনিয়ার তুচ্ছতা ও অপকারিতা এবং দুনিয়া থেকে সতর্কীকরণ

হযরত আবূ উমামাহ বাহেলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সা'লাবাহ্ ইব্নে হাতেব হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি আল্লাহ্র কাছে দোআ করে দিন, যাতে আমি মালদার-ধনী হয়ে যাই। তিনি বললেন, তাহলে কি তোমার কাছে আমার তরীকা পছন্দ নয়? তুমি কি আল্লাহ্র নবীর আদর্শের উপর থাকতে আগ্রহী নও? শুন! সেই পবিত্র সত্তার কসম, যার আয়ত্বাধীনে আমার জীবন—যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তাহলে এ পাহাড়সমূহ সোনা-রূপায় পরিণত হয়ে আমার সাথে সাথে ঘুরতো। কিন্তু এমন ধনী হওয়া পছন্দনীয় নয়। লোকটি বললো, যে পবিত্র সত্তা আপনাকে সত্য নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, যদি আপনি দোআ করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ধন-ঐশ্বর্য দান করেন, তবে আমি অবশ্যই প্রত্যেক হকদারকে তার হক ও প্রাপ্য পৌঁছিয়ে দিবো এবং আরও অন্যান্য নেক কাজ করবো। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোআ করলেন ঃ "আয় আল্লাহ্! সা'লাবাহ্কে সম্পদ দান কর।" ফলে, তার ছাগল-ভেড়ায় কীড়ার মত অসাধারণ প্রবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এমনকি মদীনায় বসবাসের জায়গাটি যখন তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন সে মদীনার বাইরে একটি প্রশস্ত উপত্যকা নিয়ে নেয়। এখানে আসার পর কেবল যোহর ও আসর এই দুই ওয়াক্তের নামায মদীনায় এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জামাতে আদায় করতো এবং (পূর্বের বিপরীত) অন্যান্য নামায সেখানেই পড়ে নিতো, যেখানে তার মালামাল ছিল।

অতঃপর এসব ছাগল-ভেড়ার আরও প্রবৃদ্ধি ঘটে, যার ফলে সে জায়গাটিতেও তার সংকুলান হয় না। সুতরাং মদীনা শহর থেকে আরও

দূরে গিয়ে কোন একটি জায়গা নিয়ে নেয়। সেখান থেকে সে শুধু জুমুআর নামাযের জন্য মদীনায় আসতো এবং অন্যান্য পাঞ্জেগানা নামাযগুলো সেখানেই পড়ে নিতো। তারপর এসব মালামাল কীড়ার মত আরও প্রবৃদ্ধি পেয়ে গেল। এখন সে জায়গাও তাকে ছাড়তে হয় এবং মদীনা থেকে বহু দূরে সরে যায়। সেখানে জুমুআ থেকেও তাকে বঞ্চিত হতে হয়। জুমুআর দিন মদীনা থেকে জুমুআ পড়ে প্রত্যাবর্তনকারীদের নিকট কেবল জিজ্ঞাসাবাদ করে সেখানকার অবস্থা জেনে নিতো।

কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের কাছে সে লোকটির অবস্থা জানতে চাইলে তারা বললো যে, তার মালামাল এতো বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে, শহরের কাছাকাছি কোথাও তার সংকুলান হয় না। ফলে, বহু দূরে কোথাও গিয়ে বসবাস করছে। এখন আর তাকে দেখা যায় না। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন,— يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ অর্থাৎ, সালাবাহ্‌র প্রতি আফসূস! সা'লাবাহ্‌র প্রতি আফসূস! সা'লাবাহ্‌র প্রতি আফসূস। ঘটনাক্রমে সে সময়েই মুসলমানদের থেকে সদকা আদায় করা সংক্রান্ত এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ط

"আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদ্‌কা গ্রহণ করুন, যদ্‌দ্বারা আপনি তাদেরকে পাক-পবিত্র করে দেন এবং তাদের জন্য দোআ করুন ; নিশ্চয় আপনার দোআ তাদের জন্য শান্তির কারণ।" (তওবাহ ঃ ১০৩)

আল্লাহ্ তা'আলা সদ্‌কার যথাযথ আইন নাযিল করলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুহাইনা গোত্রের একজন এবং সুলাইম গোত্রের একজনকে মুসলমানদের নিকট থেকে সদ্‌কা আদায় করার জন্য পাঠালেন এবং দু'জনের নিকটেই সদ্‌কার লিখিত ফরমান দিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলে দিলেন ঃ তোমরা সা'লাবাহ্‌র নিকট যাও। এছাড়া বনী সুলাইমের আরও এক লোকের কাছে

যাওয়ার হুকুম করলেন, তাদের কাছ থেকে সদ্‌কা ওসূল করার নির্দেশ দিলেন।

তারা উভয়ে যখন সা'লাবাহ্‌র নিকট গিয়ে পৌছালেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখিত ফরমান দেখালেন, তখন সা'লাবাহ্ বলতে লাগলো, এ তো জিযিয়া কর হয়ে গেল, এ তো জিযিয়া কর হয়ে গেল, এ তো জিযিয়ার ন্যায়ই আরেকটা। তারপর বললো, এখন আপনারা যান, ফেরার পথে এখানে হয়ে যাবেন। অতঃপর তারা সুলাইম গোত্রের লোকটির নিকট গেলেন। লোকটি তাদের কথা এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান শুনলো। তারপর নিজের পালিত পশু উট-বকরীসমূহের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল, তা থেকে সদ্‌কার নেসাব অনুযায়ী পশু নিয়ে স্বয়ং সে দুই ওসূলকারীর কাছে হাজির হলেন। তারা পশুগুলো দেখে বললেন, আপনার উপর এরূপ উৎকৃষ্ট পশু সদ্‌কায় দান করা ওয়াজিব নয় এবং আমরাও আপনার কাছ থেকে এগুলো নিতে পারি না। সুলাইমী লোকটি বারবার বিনয় করে বললেন, আমি নিজের খুশীতে এগুলো দিতে চাই, আপনারা কবূল করে নিন।

অতঃপর এ দুই ওসূলকারী আরও অন্যান্য মুসলমানদের সদ্‌কা আদায় করে সা'লাবাহ্‌র কাছে আসলেন এবং তার কাছে পুনরায় সদ্‌কা আদায়ের কথা বললেন তখন সে বললো, দাও দেখি সদ্‌কার আইনগুলো আমাকে দেখাও। তা দেখে সে পূর্বের কথাই বলতে লাগলো, এ তো এক রকম জিযিয়া কর-ই। যা হোক, এখন আপনারা যান, আমি চিন্তা-বিবেচনা করবো।

তারা মদীনায় ফিরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। তিনি তাদেরকে দেখেই তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই আবার সে বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করলেন, যা পূর্বে বলেছিলেন। অর্থাৎ— يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ (সা'লাবাহ্‌র প্রতি আফ্‌সূস) তারপর সুলাইমীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে দোআ করলেন। অতঃপর তাঁরা দু'জন সা'লাবাহ্ ও সুলাইমী সম্পর্কিত আচার-আচরণ বিস্তারিত শুনালেন। তখন সা'লাবাহ্ সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ
لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ فَلَمَّآ اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ
وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ
اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا
يَكْذِبُوْنَ ○

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে কোন কোন লোক এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা করেছিল যে, আল্লাহ্ যদি তাদের ধন-সম্পদ দান করেন, তবে তারা দান-খয়রাত করবে এবং উম্মতের সৎকর্মশীলদের (মত সমস্ত হকদার, আত্মীয়-স্বজন ও গরীব-মিসকীনদের প্রাপ্য আদায় করে তাদের) অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর যখন আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদ দান করলেন তখন কার্পণ্য করতে লাগলো এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যে বিমুখ হয়ে গেল। তারপর এরই পরিণতিতে তাদের অন্তরে মুনাফেকী স্থান করে নিয়েছে, সেদিন পর্যন্ত যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলবে। তা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা লংঘন করেছিল এবং এ জন্যে যে, তারা মিথ্যা কথা বলতো।

(সূরা তওবাহ্, আয়াত ঃ ৭৫,৭৬,৭৭)

এ আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন সা'লাবার কতিপয় আত্মীয় আপনজনও সে মজলিসে উপস্থিত ছিল। তাদের মধ্য হতে একজন সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হয়ে সা'লাবার কাছে গিয়ে পৌঁছলো এবং তাকে ভর্ৎসনা করে বললো, তোমার সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়ে গেছে। এ কথা শুনে সালাবাহ্ উদ্বিগ্ন হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ হাজির হয়ে আবেদন করলো, হুযূর! আমার সদ্‌কা কবূল করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তোমার সদ্‌কা কবূল করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এ কথা শুনে সে নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগলো।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তো তোমার নিজেরই কৃতকর্ম। আমি তোমাকে হুকুম করেছিলাম ; তুমি তা মান্য কর নাই। এখন আর তোমার সদ্‌কা কবূল হতে পারে না। তখন সালাবাহ্ অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেল এবং এর কিছুদিন পরই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে যায়। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) খলীফা হলে সা'লাবাহ্ তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে সদ্‌কা কবূল করার আবেদন জানালো। সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ) উত্তর দিলেন, যে ক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবূল করেন নাই, আমি কেমন করে কবূল করবো!

হযরত আবূ বকর (রাযিঃ)-এর ওফাতের পর সা'লাবাহ্ হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে আবেদন জানালো। তিনিও সেই একই উত্তর দিলেন, যা হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) দিয়েছিলেন। এরপর হযরত উসমান (রাযিঃ)-এর খেলাফত আমলেও সে নিবেদন করে। কিন্তু তিনিও অস্বীকার করেন। হযরত উসমান (রাযিঃ)-এর খেলাফতকালেই সা'লাবাহ্‌র মৃত্যু হয়।

ইমাম জরীর (রহঃ) লাইস থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা এক ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গ অবলম্বন করে তার সাথে সাথে পথ চলতে লাগলো। সে আরজ করলো, আমি আপনার সাহচর্যেই থাকবো। দু'জন পথ চলতে চলতে সমুদ্রের তীরে পৌঁছে খানা খেতে আরম্ভ করলেন। তাদের নিকট তিনটি রুটি ছিল। দুটি খেলেন আর একটি অবশিষ্ট রয়ে গেল। হযরত ঈসা (আঃ) পানি পান করার জন্য সমুদ্রের কিনারে গেলেন। কিন্তু এসে দেখেন যে, অবশিষ্ট রুটিটি নাই। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, রুটিটি কে নিলো? সে উত্তর করলো, আমি জানি না। হযরত ঈসা (আঃ) সাথীকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলেন একটি হরিণী তার দু'টি বাচ্চা নিয়ে বিচরণ করছে। তিনি একটি বাচ্চাকে ডাকলেন। তৎক্ষণাৎ সে এসে উপস্থিত হলো। সেটিকে জবাই করে ভাজা করে তা থেকে তারা উভয়ে খেলেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) বললেন ঃ قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ "আল্লাহ্‌র হুকুমে যিন্দা হয়ে যাও।" তৎক্ষণাৎ বাচ্চাটি উঠে দৌড়ে চলে গেল। হযরত ঈসা (আঃ) লোকটিকে বললেন, আমি

তোমাকে ঐ পবিত্র সত্তার কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যার কুদরতে তোমাকে এ মু'জেযা দেখিয়েছি, তুমি বল—রুটিটি কে নিয়েছে? সে বললো, আমি জানি না।

অতঃপর তারা আরও অগ্রসর হয়ে একটি নদীর তীরে পৌঁছলেন। হযরত ঈসা (আঃ) লোকটির একটি হাত আকড়িয়ে ধরে নিলেন এবং নির্দ্বিধায় পানির উপর দিয়ে নদী পার হয়ে গেলেন। এবারও তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে পবিত্র সত্তার কুদরতে আমি তোমাকে এ মুজেযা দেখালাম তার কসম দিয়ে বলছি, তুমি সত্য করে বল—সে রুটিটি কে নিয়েছে। লোকটি বললো, আমি জানি না।

অতঃপর তারা আরও অগ্রসর হলেন এবং একটি জঙ্গলে পৌঁছে বসে পড়লেন। হযরত ঈসা (আঃ) একটি মাটির ঢেলা হাতে নিয়ে বললেন, সোনা হয়ে যাও। তৎক্ষণাৎ সেটা সোনা হয়ে গেল। এটাকে হযরত ঈসা (আঃ) তিন ভাগে ভাগ করলেন এবং বললেন, এক ভাগ আমার, এক ভাগ তোমার এবং অবশিষ্ট ভাগটি যে রুটি নিয়েছে তার। এ কথা শুনে লোকটি বললো, (হুযূর!) রুটি আমি নিয়েছি। হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, এসব স্বর্ণই তোমাকে দিয়ে দিলাম। অতঃপর তিনি লোকটির নিকট থেকে পৃথক হয়ে গেলেন।

লোকটি জঙ্গল থেকে এখনও বের হয় নাই ; এমন সময় দুজন দস্যু এসে হাজির হলো এবং তার কাছে মূল্যবান সম্পদ পেয়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। তখন লোকটি বললো, আমাকে হত্যা করো না, এই স্বর্ণ আমরা তিনজনেই সমানভাবে ভাগ করে নিলাম ; আমাদের মধ্য হতে একজনকে বাজারে পাঠাও, খাদ্য খরিদ করে আনবে, আমরা এখন সকলেই খাবো। তারা একজনকে খাদ্যের জন্য বাজারে পাঠালো। বাজারে প্রেরিত লোকটি মনে মনে চিন্তা করলো—আমি এই স্বর্ণ ভাগাভাগি হতে দেই কেন? খাদ্যের মধ্যে তাদের অজান্তে বিষ মিশিয়ে দেই ; এতে তারা দু'জন খানা খেয়েই বিষক্রিয়ায় মারা যাবে আর সম্পূর্ণ স্বর্ণ একা আমিই নিয়ে নিবো। এই চিন্তা করে সে খাদ্যের সাথে বিষ মিশিয়ে তা নিয়ে উপস্থিত হলো। ওদিকে যে দু'জন জঙ্গলে রয়ে গিয়েছিল, তারা চিন্তা করলো—আমরা সেই লোককে স্বর্ণের এক তৃতীয়াংশ কেন দেই ; বরং সে এলেই তাকে আমরা

হত্যা করবো এবং আমরা দু'জনেই স্বর্ণ ভাগ করে নিয়ে নিবো। ঘটনার বর্ণনাকারী বলেন, যেই চিন্তা সেই কাজ—লোকটি বাজার থেকে আসলে তাকে তারা হত্যা করে ফেললো এবং খাদ্য খেয়ে নিলো। ফলে, খাদ্যের সাথে মিশ্রিত বিষক্রিয়ায় এরা দুজনও মারা গেল। এখন শুধু স্বর্ণ এবং পার্শ্বে তিনটি লাশ খালি জঙ্গলে পড়ে রইল। হযরত ঈসা (আঃ) ফেরার পথে এদিক দিয়ে আসছিলেন, তখন তিনি তার সঙ্গীদেরকে বললেন—এরই নাম দুনিয়া ; সতর্ক থেকো, সাবধানে চলো।

একদা বাদশাহ্ যুল-কারনাইন এক সম্প্রদায়ের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে থামলেন। তাদের অবস্থা ছিল—মানুষের জন্য উপাদেয় উপকরণ বলতে যা আছে, তা কিছুই তাদের কাছে ছিল না। এরা প্রচুর পরিমাণে কবর খুঁড়ে রেখেছিল। ভোর হতেই কবরের পার্শ্বে গিয়ে উপস্থিত হতো। সেগুলোর দেখা-শুনা করতো। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতো। নামায পড়তো। চতুষ্পদ জন্তুর মত সবুজ-তাজা ঘাস ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করতো। এসব তরুলতার উপরই তারা সম্পূর্ণ জীবিকা নির্বাহ করতো।

বাদশাহ্ যুল-কারনাইন তাদের শাসন পরিচালকের নিকট লোক পাঠিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য সংবাদ দিলেন। কিন্তু সে জওয়াব দিল, তাঁকে আমার কোন প্রয়োজন নাই, বরং তার যদি আমার নিকট কোন প্রয়োজন থাকে, তবে তিনিই আমার কাছে আসুন। যুল-কারনাইন এ উত্তর পেয়ে বললেন, সে ঠিকই বলেছে। অতঃপর তিনি নিজেই শাসনকর্তার নিকট গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আপনাকে সংবাদ দেওয়ার পর আপনি উপস্থিত না হওয়াতে আমি নিজেই হাজির হলাম। সে বললো, আমার কোন প্রয়োজন থাকলে অবশ্যই আমি হাজির হতাম। যুল-কারনাইন জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার আপনাদেরকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় ব্যতিক্রমী দেখি? শাসনকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার এ কথার অর্থ কি? তিনি বললেন, অর্থাৎ দুনিয়ার সাথে কিছুমাত্র সম্পর্কও আপনাদের দেখছি না, আপনারা সোনা-রূপা প্রভৃতি কিছুই জমা করেন নাই, যদ্দ্বারা উপকৃত হবেন? শাসনকর্তা বলতে লাগলেন, আমরা এসবকে ঘৃণা করি। কারণ, দেখা গেছে, যাদের হাতেই সম্পদ হয়েছে, তারাই দুনিয়া এবং দুনিয়ার সম্পদের মোহে মত্ত হয়ে গেছে। ফলে, এতোদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ থেকে

তারা বঞ্চিত রয়ে গেছে। যুল-কারনাইন জিজ্ঞাসা করলেন, এর কি কারণ যে, আপনারা কবর খুঁড়ে রেখেছেন, ভোর-সকালে এসে সেগুলোর দেখা-শুনা করেন, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন? শাসনকর্তা বললেন, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন আমরা এসব কবর এবং আমাদের পার্থিব আশা-আকাংখার প্রতি দৃষ্টি করবো তখন এসব কবর আমাদেরকে দুনিয়ার আশা-আকাংখা ও লোভ-লালসা থেকে বিরত রাখবে।

যুল-কারনাইন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা তরুলতা খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন ; এছাড়া আহারের যোগ্য আরকিছু আপনাদের নিকট দেখি না, আপনারা কি চতুষ্পদ জন্তু পালন করে সেগুলোর দুধ পান করে জীবন কাটাতে পারেন না? তাছাড়া এসব জন্তুকে আপনারা সওয়ারীর কাজেও ব্যবহার করতে পারেন। শাসনকর্তা বললেন, আমরা আমাদের উদরকে জীব-জানোয়ারের কবর বানাতে পছন্দ করি না। আমাদের অভিজ্ঞতা যে, যমীনের উদ্ভিদ আহার করেই আমরা তৃপ্ত হয়ে যাই। বস্তুতঃ আদম-সন্তানের জন্য অতি সাধারণ ও মামুলী খাদ্যই যথেষ্ট ; গলধঃকরণের পর যে কোন ধরনের খাদ্যের স্বাদ আর বাকী থাকে না। এ কথা বলার পর শাসনকর্তা যুল-কারনাইনের পশ্চাৎ থেকে হাত বাড়িয়ে একটি মৃতদেহের ধ্বংসাবশেষ মাথার খুলি উঠিয়ে তাকে বললেন, আপনি কি জানেন—এ লোকটি কে? তিনি অজ্ঞতা ব্যক্ত করে লোকটির পরিচয় জানতে চাইলে শাসনকর্তা বললেন, সে এ পৃথিবীর একজন বাদশাহ। বহু ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল সে। কিন্তু জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অনাচার, খেয়ানত ও অবাধ্যতার সীমা অতিক্রম করার পর সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আজকে তার ধ্বংসাবশেষের অবস্থা এই। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা তার সমস্ত কৃতকর্ম লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন ; পরকালের সেই বিচার দিনে তার শাস্তি হবে। অতঃপর আরেকটি মাথার খুলি উঠিয়ে শাসনকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি জানেন ইনি কে? যুল-কারনাইন অজ্ঞতা প্রকাশ করে পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, ইনিও একজন বাদ্শাহ, পূর্বের জালেম বাদশাহর পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অধিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু তিনি পূর্বের বাদশাহর বিপরীত জুলুম-অত্যাচার ও অন্যায়-অনাচার থেকে দূরে রয়েছেন। রাজ্যে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহর সম্মুখে বিনয় ও নিষ্ঠা অবলম্বন করেছেন।

পরিশেষে তিনিও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং আজকে তারও অস্তিত্বের অবস্থা এই, যা আপনি অবলোকন করছেন। কিন্তু তাঁর আমলনামাও আল্লাহর নিকট লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত রয়েছে। আখেরাতে তিনি আল্লাহর কাছে পুরস্কারপ্রাপ্ত হবেন।

অতঃপর বাদশাহ-যুল-কারনাইনের মাথার খুলির দিকে দৃষ্টি করে শাসনকর্তা বললেন, আপনার এ খুলির অবস্থাও উক্ত খুলিদ্বয়ের যে কোন একটির ন্যায় হবে। আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন—কোন্ অবস্থার অনুকূলে আপনি জীবন পরিচালনা করে যাচ্ছেন। যুল-কারনাইন বললেন, হে শাসনকর্তা! আপনি কি আমার সাথীত্ব গ্রহণ করতে সম্মত আছেন? আপনাকে ভাই হিসাবে গ্রহণ করে নিবো। আপনি আমার ওজীর ও পরামর্শদাতা হবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে যা কিছু দিয়েছেন, তাতে আপনাকে শরীক করে নিচ্ছি। তিনি বললেন, আপনার এবং আমার একই অবস্থানে একত্রিত হওয়া ঠিক নয়, বরং এহেন সহঅবস্থান অবলম্বন করা আমাদের উভয়ের মধ্যে কারও পক্ষে সম্ভব হবে না। যুল-কারনাইন কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, এর কারণ হচ্ছে, মানুষ আপনার শত্রু এবং আমার বন্ধু। যুল-কারনাইন বললেন, এর কারণ? তিনি বললেন, আপনার ধন-ঐশ্বর্যের কারণে তারা আপনার শত্রুতে পরিণত হয়েছে। আর আমি এসব কিছু পরিত্যাগ করেছি, কাজেই আমার শত্রু কেউ নাই। যুল-কারনাইন এতদশ্রবণে অবাক-বিস্ময়ে অভিভূত হোন এবং অন্তরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়ে আপন গন্তব্যের পথে বিদায় নেন।

জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন ঃ

يَا مَنْ تَمَتَّعَ بِالدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا
وَلَا تَنَامُ عَنِ اللَّذَّاتِ عَيْنَاهُ

ওহে, যে দুনিয়ার চাকচিক্য ও ভোগ-বিলাসে মত্ত রয়েছ, এমনকি এই ভোগমত্ততার কারণে রাতের নিদ্রা পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়েছ—

شَغَلْتَ نَفْسَكَ فِيْمَا لَيْسَ تُدْرِكُهُ

تَقُوْلُ لِلّٰهِ مَاذَا حِيْنَ تَلْقَاهُ

প্রবৃত্তির তাড়নায় তুমি এমন এক বস্তুর পিছনে পড়ে রয়েছ যা কোনদিন পাবে না। উপরন্তু যেদিন তুমি আল্লাহর সম্মুখীন হবে, সেদিন আল্লাহর কাছে তোমার কি জবাবদিহি হবে?

মাহমুদ বাহেলী (রহঃ) আবৃত্তি করেছেন ঃ

اَلَا اِنَّمَا الدُّنْيَا عَلَى الْمَرْءِ فِتْنَةٌ
عَلٰى كُلِّ حَالٍ اَقْبَلَتْ اَوْ تَوَلَّتْ

"জেনে রাখ, এ দুনিয়া হাসিল হোক আর না হোক সর্বাবস্থায়ই সে মানুষের জন্য ফেতনা ও পরীক্ষা।"

فَاِنْ اَقْبَلَتْ فَاسْتَقْبِلِ الشُّكْرَ دَائِمًا
وَمَهْمَا تَوَلَّتْ فَاصْطَبِرْ وَتَثَبَّتْ

"কাজেই দুনিয়া যদি তোমার অনুকূলে আসে, তাহলে তুমি সর্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যদি প্রতিকূল হয়, তবে ধৈর্য ধারণ কর এবং দৃঢ় থাক।"

অধ্যায় ঃ ৬০

দান-খয়রাত ও সদ্‌কার ফযীলত

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, "যে ব্যক্তি একটি ক্ষুদ্র খেজুর পরিমাণও হালাল উপার্জন থেকে আল্লাহ্‌র পথে দান করে—জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ কেবল হালাল বস্তুই কবুল করেন— আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই দানকৃত বস্তু ডান হাতে গ্রহণ করে নেন ; এতে বরকত ও কল্যাণ দিয়ে ভরে দেন, অতঃপর এটিকে দাতার অনুকূলে লালন করতে থাকেন যেমন তোমরা শিশুকে লালন কর। এভাবে সেই বস্তুটি পাহাড়সম বৃহৎ রূপ ধারণ করে। পবিত্র কুরআনে এর সপক্ষে সাক্ষ্য রয়েছে, ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ

"তারা কি অবগত নয় যে, আল্লাহ্‌ই নিজ বান্দাদের তওবা কবূল করেন, আর তিনিই সদ্‌কা-খয়রাত কবূল করেন।" (তওবাহ্‌ ঃ ১০৪)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

"আল্লাহ্‌ সূদকে ধ্বংস করে দেন এবং সদ্‌কাকে বৃদ্ধি করে দেন।" (বাকারাহ্‌ ঃ ২৭৬)

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا
وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ.

"দানে কখনও ধন কমে না। ক্ষমায় ক্ষমতা ও ইয্যত-সম্মান বাড়ে। আল্লাহ্র জন্যে বিনয় অবলম্বন ও নম্র স্বভাব উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে।"

ত্বব্রানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "দান-খয়রাত মাল-সম্পদে কোনরূপ ঘাট্তি আনয়ন করে না। বান্দা দান-খয়রাতের জন্য হাত বাড়ানোর সাথে সাথে প্রদত্ত বস্তু গ্রহীতার হাতে পৌছার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করে নেন।"

আরও বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি এমন কোন বস্তুর জন্য যা না হলেও তার চলে, যদি কারও কাছে হাত পাতলো, তবে আল্লাহ্ তার অভাবের দরজা খুলে দেন, অর্থাৎ তার অভাব-অনটন লেগেই থাকবে।"

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِىْ مَالِىْ وَاِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلٰثٌ مَا اَكَلَ فَاَفْنٰى اَوْ لَبِسَ فَاَبْلٰى اَوْ اَعْطٰى فَاَقْتَنٰى وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ ـ

"বান্দা বলে, আমার মাল আমার মাল। অথচ সম্পদের যে অংশটুকু সে তিন কাজে ব্যয় করতে পেরেছে, কেবল সে অংশটুকুই তার ঃ এক. যা খেয়ে শেষ করলো দুই. যা পরিধান করে পুরানো-অকেজো করলো এবং তিন. যা আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে জমা রাখলো। এ ছাড়া আর যা থাকবে, তা তার নয় ; অন্যদের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তি।"

বর্ণিত আছে, তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি কথা বলবেন, অর্থাৎ মাঝে কোন দু'ভাষী হবে না। সে ডানে তাকাবে, দেখবে শুধু যা পাঠিয়েছে তা। বামে তাকাবে, দেখবে শুধু যা পাঠিয়েছে তা। সামনে তাকাবে, দেখবে শুধু আগুনই আগুন ; যা তার চেহারা বরাবর বিরাজ করছে। অতএব, তোমরা আগুন থেকে বাঁচ ; খেজুরের একটি ক্ষুদ্রাংশ দিয়ে হলেও।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ـ

"পানি যেমন আগুন নিভিয়ে দেয়, দান-খয়রাত ও সদ্কা তেমনি পাপ মোচন করে দেয়।"

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'ব ইব্নে আজ্রাহ্ (রাযিঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلٰى سُحْتٍ اَلنَّارُ اَوْلٰى بِهِ الخ

"হারাম খাদ্যের দ্বারা উৎসারিত রক্ত-মাংস বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না ; বরং দোযখেরই যোগ্য। হে কা'ব ইব্নে আজ্রাহ্! সকল মানুষই দুনিয়া থেকে বিদায় হয় ; কিন্তু কেউ বিদায় হয় দোযখের আগুন থেকে নিজকে মুক্ত করে আর কেউ নিজের জীবন ধ্বংস করে দোযখের উপযুক্ত হয়ে। হে কা'ব ! নামাযে আল্লাহ্র নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ হয় আর রোযা হচ্ছে (দোযখের আগুন থেকে আত্মরক্ষার জন্য) ঢালস্বরূপ। সদ্কা ও দান-খয়রাত গুনাহ্সমূহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমন সবল লোক ভারী পাথরকে সরিয়ে দেয়। অন্য রেওয়ায়াতে আছে যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।"

বর্ণিত আছে, "সদ্কা ও দান-খয়রাত খোদায়ী গজবকে ফিরিয়ে রাখে, অপমৃত্যু থেকে হেফাযত করে।"

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সদ্কার ওসীলায় অপমৃত্যুর সত্তরটি দরজা বন্ধ করে দেন।

হাদীস শরীফে আরও আছে, "ক্বেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত দাতা ব্যক্তিগণ নিজ নিজ সদ্কার ছায়ায় অবস্থান করবে।"

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, "কখনও এমন হয় যে, মানুষ কিছু সদ্কা করে, ফলতঃ শয়তানের সত্তরটি জাল ভেঙ্গে যায়।"

একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সর্বোত্তম সদ্কা কোন্টি? তিনি বললেন, "অভাবী হয়েও দান করা ; তোমার দান তাদের থেকেই আরম্ভ কর যাদের ব্যয়ভার

বহন করা তোমার দায়িত্ব।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, এক দেরহাম পরিমাণ দানের সওয়াব একশত দেরহামের সওয়াবকেও অতিক্রম করে গেছে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা কি করে? তিনি বললেন, "এক ব্যক্তির নিকট প্রচুর পরিমাণ মাল-সম্পদ আছে, সে এক পার্শ্ব থেকে একশত দেরহাম দান করলো। অপরদিকে একজন অভাবী লোকের নিকট মাত্র দুই দেরহাম আছে, তন্মধ্য থেকে সে একটি দেরহাম দান করে দিল।"

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ ভিক্ষুক বা প্রার্থী (আব্‌দারকারী)-কে কখনও ফিরিয়ে দিও না। কিছু দিতে না পার—অন্ততঃপক্ষে একটি ক্ষুর হলেও তাকে দাও।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ "সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তা'আলা এমন দিনে (অর্থাৎ হাশরের দিন) আরশের নীচে ছায়াতলে স্থান দিবেন, যেদিন এ ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক তারা, যারা এমন গোপনে দান-খয়রাত করে যে, বাম হাত পর্যন্ত টের করতে পারে না যে, তাদের ডান হাত কি করছে।"

ত্বব্‌রানী শরীফের এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, "সৎকাজে মানুষকে বিপর্যয় ও প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করে, গোপন সদ্‌কা আল্লাহ্‌র রোষ নির্বাপিত করে এবং আত্মীয়তার সংরক্ষণ আয়ু বর্ধিত করে। বস্তুতঃ প্রতিটি নেক কাজই সদ্‌কা। দুনিয়াতে যারা সৎ আখেরাতেও তারা সৎ, পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যারা অসৎ আখেরাতেও তারা অসৎ। বেহেশ্‌তে সৎলোকেরাই প্রথম প্রবেশ করবে।"

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করেছেন—সদ্‌কা কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "বহু গুণ অতিরিক্ত সওয়াব যে আমলটির, সেটিই সদ্‌কা—আল্লাহ্‌র কাছে আরও অধিক সওয়াব রয়েছে।" অতঃপর এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً

"কে আছে, যে আল্লাহ্‌কে করজ দিবে উত্তম করজ দেওয়া, অতঃপর

আল্লাহ্ এ-কে তার জন্য বর্ধিত করে দিবেন বহুগুণে।" (বাক্বারাহ্ ঃ ২৪৫)

আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সর্বোত্তম সদ্‌কা কোন্‌টি? তিনি বললেন, অভাবীকে গোপনে যা দান করা হয় আর নিজের অভাব-অনটন সত্ত্বেও কষ্ট সহ্য করে যা দিয়ে অপরের সাহায্য করা হয়। অতঃপর এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ

"তোমরা যদি সদ্‌কাসমূহ প্রকাশ্যে প্রদান কর সে-ও ভাল কথা। আর যদি এতে গোপনীয়তা অবলম্বন কর এবং দরিদ্রদেরকে দিয়ে দাও, তবে তোমাদের জন্য অতি উত্তম।" (বাক্বারাহ্ ঃ ২৭১)

হাদীস শরীফে আছে, কোন মুসলমান বিবস্ত্র কোন মুসলমানকে পোষাক দান করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বেহেশ্‌তের সবুজ পোষাক পরিধান করাবেন। কোন অভুক্ত মুসলমানকে খাদ্য খাওয়ালে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বেহেশ্‌তের ফল খাওয়াবেন। আর যদি কোন মুসলমান পিপাসার্ত কোন মুসলমানকে পানি পান করায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বেহেশ্‌তের সিল-মোহরযুক্ত খোশবূদার শরাব পান করাবেন।

হাদীস শরীফে আছে, মিসকীনকে দান করলে যে ক্ষেত্রে এক সদ্‌কার সওয়াব লাভ হয়, গরীব অভাবী আত্মীয়কে দান করলে দ্বিগুণ সওয়াব হয়—এক, সদ্‌কার, দ্বিতীয়, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার।

এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উত্তম সদ্‌কা কোন্‌টি? নবীজী বলেছেন, তোমার যে আত্মীয় তোমার সাথে গোপনে শত্রুতা পোষণ করে, তাকে দান করা উত্তম সদ্‌কা।

বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি একটি দুগ্ধবতী পশু (উস্ট্রী, গাভী, ছাগল প্রভৃতি) অপরকে এই মর্মে দান করে যে, সে এ থেকে দুধ পান করবে এবং পরে তা ফিরিয়ে দিবে, অথবা কেউ যদি অপরকে ঋণ দেয় কিংবা সফরসাথীকে কেউ যদি হাদিয়া-উপহার পেশ করে, তবে এতে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব হবে।

বর্ণিত আছে যে,

كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ.

"ঋণদান একটি বিশেষ সদ্কা।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

رَأَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِى عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ.

"যে রাত্রিতে আমাকে ইস্রা ও মিরাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সে রাত্রিতে আমি দেখেছি—বেহেশ্তের দরজায় লিখিত রয়েছে যে, সদ্কা বা দানের সওয়াব দশগুণ আর ঋণ প্রদানের সওয়াব আঠার গুণ।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদের যে সাহায্য করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলা তার সাহায্য করবেন।

বর্ণিত আছে, একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ইসলাম কোন্‌টি? তিনি বললেন, আহার করাও এবং পরিচিত অপরিচিত সকল (মুসলমান)-কে সালাম দাও।

বর্ণিত আছে, এক সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে দুনিয়ার সবকিছু সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃষ্ট। রাবী বলেন, আমি পুনরায় আরজ করলাম, আমি কি আমল করলে বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবো? হুযূর বললেন ঃ আহার করাও, সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটাও, আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় কর এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তুমি নামায (তাহাজ্জুদ) পড়। তাহলে তুমি নিরাপদে বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে।

আরও বর্ণিত হয়েছে, যেসব কাজে আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হয়, তন্মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে খানা খাওয়ানো।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজ ভাইকে তৃপ্ত করে আহার করিয়েছে, পানি পান করিয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তিকে দোযখ

থেকে সাত খন্দক দূরে রাখবেন। দুই খন্দকের মধ্যবর্তী দূরত্বের পরিমাণ হচ্ছে পাঁচশত বছরের পথ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, হে আদম-সন্তান! আমি পীড়িত হয়েছিলাম আর তুমি আমাকে দেখতে আস নাই। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমি কিভাবে আপনাকে দেখতে আসবো অথচ আপনিই সমস্ত জগতের প্রতিপালক প্রভু? আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার বান্দা অমুক পীড়িত হয়েছিল আর তুমি তাকে দেখতে যাও নাই? তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে নিশ্চয় আমাকে তার নিকট পেতে?

হে আদম-সন্তান! আমি তোমার নিকট খানা চেয়েছিলাম তুমি আমাকে খানা দেও নাই। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমি আপনাকে কিরূপে খানা দিতাম অথচ আপনিই সমস্ত জগতের প্রতিপালক প্রভূ? তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার বান্দা অমুক তোমার নিকট খানা চেয়েছিল আর তুমি তাকে খানা দেও নাই? তুমি কি জানতে না যে, যদি তাকে খানা দিতে নিশ্চয় তা আমার নিকট পেতে?

আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম-সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম আর তুমি আমাকে পানি পান করাও নাই। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমি আপনাকে কিরূপে পানি পান করাবো, যখন আপনিই সমস্ত জগতের প্রতিপালক প্রভু? তিনি বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল আর তুমি তাকে পানি পান করাও নাই। তুমি কি জানতে না যে, যদি তাকে পানি পান করাতে তবে তা আমার নিকট পেতে?

অধ্যায় ঃ ৬১

মুসলমান ভাইয়ের উপকার সাধন ও প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص

"তোমরা সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অপরের সহযোগিতা কর।"
(মায়িদাহ্ ঃ ২)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যার্থে তার উপকার সাধনের নিমিত্ত অগ্রসর হবে, তার আমলনামায় আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের সমতুল্য সওয়াব লেখা হবে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ لِلّٰهِ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِقَضَاءِ حَوَائِجِ النَّاسِ اٰلٰى عَلٰى نَفْسِهٖ اَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ بِالنَّارِ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وُضِعَتْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يُحَدِّثُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَالنَّاسُ فِى الْحِسَابِ۔

"আল্লাহ্ তা'আলার এমন কিছু মখলূক রয়েছে, যাদেরকে তিনি মানুষের উপকার সাধন ও প্রয়োজন মিটানোর জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ পাক নিজ পবিত্র সত্তার কসম করে বলেছেন—তাদেরকে তিনি দোযখ-আগুনের শাস্তি দিবেন না কখনও। ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য নূরের মঞ্চ তৈয়ার করা হবে। অন্যান্য লোকেরা যখন হিসাবে ব্যস্ত থাকবে, তখন তারা আল্লাহ্র সাথে কথোপকথনে মগ্ন থাকবে।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ سَعٰى لِاَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فِىْ حَاجَةٍ قُضِيَتْ لَهٗ اَوْ لَمْ تُقْضَ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ وَكُتِبَ لَهٗ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ۔

"যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের কোন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে, অতঃপর তা সমাধা হোক না হোক, আল্লাহ্ তা'আলা তার অতীত ও ভবিষ্যতের গুনাহ্ মাফ করে দিবেন এবং দু' বিষয়ের মুক্তিপত্র লিখে দিবেন ঃ এক. দোযখের আগুণ থেকে মুক্তি দুই.নেফাক (মুনাফেকী) থেকে মুক্তি।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের উপকারার্থে কোন পথে অগ্রসর হবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি কদমে সত্তরটি নেকী লিখবেন এবং সত্তরটি গুনাহ্ মোচন করবেন। যদি মুসলমান ভাইয়ের উপকার সাধন হয়, তবে সে গুনাহ্ থেকে সদ্যপ্রসুত শিশুর ন্যায় পবিত্র হয়ে যাবে। আর যদি চেষ্টারত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে বিনা হিসাবে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে তার প্রয়োজন ও সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলো এবং তাকে সৎ পরামর্শ দিল, আল্লাহ্ তা'আলা দোযখ ও তার মাঝে সাত খন্দক দূরত্ব স্থাপন করে দিবেন—এক খন্দক থেকে অপর খন্দক পর্যন্ত দূরত্ব হবে যমীন ও আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।"

হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কোন কোন সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ তা'আলা প্রচুর নেয়ামত ও ধন-ঐশ্বর্য দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত তারা মুক্ত মনে মানুষের কল্যাণ সাধন ও অভাব দূরীকরণে ব্রতী থাকে, সেই নেয়ামত তাদের কাছেই

স্থায়ী রাখেন। আর যদি এরা সংকীর্ণ-হৃদয় হয়ে যায়, তবে তা অন্যদেরকে দিয়ে দেন।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা কি জান—জঙ্গলের বাঘ হুংকার দিয়ে কি বলে? সাহাবীগণ আরজ করলেন, আল্লাহ্ ও রাসূলই উত্তম জানেন। তিনি বললেন, বাঘ বলে, আয় আল্লাহ্! আমি যেন কোন সৎলোকের উপর চড়াও (হামলা) না করি।

হযরত আলী (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "তোমাদের কারও যদি কোনকিছুর প্রয়োজন বা সমস্যা দেখা দেয়, তবে সেটা সমাধানের জন্য জুমারাতে (বৃহস্পতিবারে) ভোর-সকালে রওনা হও এবং ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সূরা আলি-ইমরানের শেষ কয়েকখানি আয়াত, আয়াতুল-কুরসী, সূরা কদর ও সূরা ফাতেহা পড়ে নাও। কেননা, এতে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল মকসূদ পূরণ হয়।"

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে হাসান ইব্‌নে হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একদা আমার কোন একটি প্রয়োজনে আমি হযরত উমর ইব্‌নে আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়েছিলাম। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, আপনার যখনই কোনকিছুর প্রয়োজন হয়, আমার এখানে লোক পাঠিয়ে দিবেন (আমি তৎক্ষণাৎ আপনার হুকুম পালনার্থে কাজ করে দিবো)। আমি আল্লাহ্‌র সম্মুখে বড় লজ্জিত হই, যখন দেখি—আপনি স্বয়ং আমার দরজায় উপস্থিত হয়েছেন।"

ইব্‌নে হাব্বান ও হাকেম (রহঃ) রেওয়ায়াত করেছেন যে, একদা এক ব্যক্তি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি বড় গুনাহ্ করে ফেলেছি ; আমার জন্যে কি কোন তওবা আছে? হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা জীবিত আছেন? লোকটি বললো, না। হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার খালা জীবিত আছেন? লোকটি বললো, হাঁ। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলে দিলেন, তুমি তোমার খালার সাথে সদ্ব্যবহার কর।

বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইরশাদ করেন ঃ "সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে সদ্ব্যবহার করার নাম ছেলা-রেহ্‌মী বা আত্মীয়তা রক্ষা করা নয়, বরং প্রকৃত ছেলা-রেহ্‌মী হচ্ছে, আত্মীয়তা ছেদনকারীর সাথে আত্মীয়তা অটুট রাখা।"

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, ঐ সত্তার কসম যিনি দুনিয়ার সকল আওয়াজ শুনেন, যে কোন ব্যক্তি যদি কারও মনে আনন্দ দিতে পারে অর্থাৎ তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে, আল্লাহ্ তা'আলা এই আনন্দ দানের বিনিময়ে বান্দার জন্য 'লুতফ ও মেহেরবানী' সৃষ্টি করেন। যে কোন মুসীবতে সে পতিত হলে 'আল্লাহ্‌র মেহেরবানী' তার প্রতি উঁচু স্থান থেকে নিম্নপানে প্রবাহিত পানির ন্যায় দ্রুত ধাবিত হয় এবং তার মুসীবত এমন ভাবে দূর করে দেয়, যেমন নিজ শস্যখেত থেকে মালিক অন্যের উট তাড়িয়ে দেয়।

হযরত আলী (রাযিঃ) আরও বলেছেন, নীচ ও অযোগ্য লোকের কাছে নিজের প্রয়োজন অন্বেষণ অপেক্ষা গোটা প্রয়োজনটিই ভুলে যাওয়া আরও সহজতর বিষয়।

তিনি আরও বলেছেন যে, কারও কাছে নিজের প্রয়োজনের তাগিদে বারবার যেয়ো না। কেননা, গোবৎস গাভীর স্তন্যপানে সীমা অতিক্রম করলে তাকে শিং মেরে দেয়।

জনৈক আরবী কবি বলেছেন, যার সারমর্ম হচ্ছে, যতদিন তোমার সামর্থ ও সুযোগ আছে, অন্যের উপকার ও কল্যাণ সাধনে অবহেলা করো না। তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র করুণা ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর—তোমাকে তিনি অন্যের প্রতি এহ্‌সান ও অনুগ্রহ করার যোগ্য করেছেন এবং তোমাকে অপর থেকে অনেপক্ষ ও অমুখাপেক্ষী রেখেছেন।

অপর একজন বলেছেন, নিজের শক্তি সামর্থ অনুযায়ী মানুষের কল্যাণ সাধন ও অভাব দূরীকরণে ব্যাপৃত থাক। কেননা, এতে তোমার জীবনের এ দিনগুলোই হবে সর্বোৎকৃষ্ট দিন।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যার হাতকে আল্লাহ্ তা'আলা মানবের কল্যাণের নিমিত্ত কবূল করে নিয়েছেন। আর ধ্বংস ঐ ব্যক্তির যার হস্তে মানুষের ক্ষতিই সাধিত হয়।"

অধ্যায় ঃ ৬২

উযূর ফযীলত

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهٗ فِيْهِمَا بِشَيْءٍ مِّنَ الدُّنْيَا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهٖ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ.

"যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে দুই রাকাত নামায এমনভাবে আদায় করলো যে, পার্থিব কোন বিষয় সম্পর্কে নামাযের মধ্যে সে কোনরূপ চিন্তা করলো না, সে ব্যক্তি সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যাবে।"

অন্য সূত্রে আরও সংযোজিত হয়ে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَلَمْ يَسْهُ فِيْهِمَا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ.

অর্থাৎ—উপরোক্ত দুই রাকাতে যদি সে কোনরূপ ভুল-ত্রুটি না করে, তাহলে (এই উযূ ও নামাযের ওসীলায়) আল্লাহ্ তা'আলা তার অতীতের গুনাহ্ মা'ফ করে দিবেন।

হাদীসে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ "আমি কি তোমাদেরকে বলবো—কি কাজ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গুনাহ্ মা'ফ করবেন এবং তোমাদের মর্যাদা বুলন্দ করবেন? তবে শুন, তা হচ্ছে—কষ্ট-ক্লিষ্টের অবস্থায়ও পরিপূর্ণ উযূ করা, মসজিদে বেশী বেশী উপস্থিত হওয়া ; এক, নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করা—এ হচ্ছে রাবাত। কথাটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার উচ্চারণ করেছেন। অর্থাৎ জিহাদের সময় সীমান্ত প্রহরার যে মর্যাদা, নামাযের জন্য অপেক্ষা করারও সেই মর্যাদা রয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূর অঙ্গসমূহ একবার

করে ধৌত করে বলেছেন ঃ 'অন্ততঃপক্ষে একবার ধৌত না করলে এ দ্বারা নামায কবূল হবে না।' (অতঃপর) দুইবার করে ধৌত করে বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি দু'বার করে ধৌত করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন। (অতঃপর) উযূর প্রতিটি অঙ্গ তিন তিনবার ধৌত করে বলেছেন ঃ "এ হচ্ছে আমার, আমার পূর্বেকার আম্বিয়া-কেরামের এবং পরম করুণাময়ের পরম বন্ধু হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের উযূ।"

হাদীস শরীফে আছে ঃ "উযূর সময় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র যিক্র (স্মরণ) করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সমস্ত দেহকে গুনাহ্ হতে পবিত্র করে দিবেন।" আর যে যিক্র করবে না ; তার কেবল উযূর অঙ্গগুলো আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র করবেন।"

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি উযূ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও পুনরায় উযূ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার আমলনামায় দশটি নেকী লিখে দিবেন।' আরও বর্ণিত আছে ঃ 'উযূর উপর উযূ অর্থ নূর-এর উপর নূর।' বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব মহান উক্তি উম্মতকে তাজা উযূর জন্যে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যেই বিবৃত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "যখন কোন মুসলিম বান্দা উযূ করে এবং কুলি করে তখন তার গুনাহ্সমূহ মুখ হতে বের হয়ে যায়, যখন নাক ধৌত করে তখন তার গুনাহ্সমূহ নাক হতে বের হয়ে যায়, যখন চেহারা ধৌত করে তখন চেহারা হতে গুনাহ্সমূহ নির্গত হয়ে যায় এমনকি তার দুই চোখের পাতার নীচ হতেও গুনাহ্ নির্গত হয়ে যায়। অতঃপর যখন সে দুই হাত ধোয় তখন তার দুই হাত হতেও গুনাহ্সমূহ বের হয়ে যায় এমনকি দুই হাতের নখসমূহের নীচ হতেও গুনাহ্সমূহ বের হয়ে যায়। অতঃপর যখন সে মাথা মসেহ্ করে তখন তার মাথা হতে গুনাহ্সমূহ বের হয়ে যায় এমনকি তার দুই কান হতেও বের হয়ে যায়। অবশেষে যখন সে দুই পা ধোয় তখন দুই পা হতে গুনাহ্সমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার দু' পায়ের নখসমূহের নীচ হতেও বের হয়ে যায়। অতঃপর তার মসজিদের দিকে গমন ও নামায

হয় তার জন্য অতিরিক্ত (অর্থাৎ অধিক সওয়াবের কারণ।"

বর্ণিত আছে ঃ "বা-উযূ (যে উযূ অবস্থায় আছে) ব্যক্তি রোযাদারের ন্যায়।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূকার্য সম্পন্ন করে আকাশের দিকে দৃষ্টি করে পড়বে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَـهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُـهٗ۔

তার জন্য বেহেশ্তের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে ; যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে।"

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন ঃ "সত্যিকার উযূ তোমা হতে শয়তানকে দূরে সরিয়ে রাখবে।"

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ "তোমরা উযূ অবস্থায় আল্লাহ্র যিক্র ও এস্তেগফার করতে করতে নিদ্রা যাও, কেননা রূহ্ যে অবস্থায় কবজ করা হবে, (ক্বিয়ামতের দিন) তাকে সে অবস্থায়ই উঠানো হবে।"

বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রাযিঃ) এক সাহাবীকে কা'বা শরীফের গিলাফ আনার জন্য মিসর পাঠিয়েছিলেন। পথিমধ্যে শ্যাম দেশে এক দরবেশ ব্যক্তির বাড়ীর সন্নিকটে তিনি অবস্থান করলেন। দরবেশ ছিলেন একজন যবরদস্ত বিজ্ঞ ও আলেম লোক। তাই সাহাবী তাঁর নিকট কিছু জ্ঞানের কথা জানার জন্য তাঁর বাড়ীতে গেলেন। দরজায় আওয়ায দেওয়ার পর দরবেশ লোকটি যথেষ্ট বিলম্ব করে ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন। সাহাবী তার নিকট হতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করার পর দীর্ঘ সময় বিলম্ব করে দরজা খোলার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। জওয়াবে দরবেশ বললেন ঃ "আপনি খলীফার পক্ষ হতে রাজকীয় প্রভাব ও শান-শওকত নিয়ে আসছেন—তা দেখে আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেছি এবং দরজাতেই আপনাকে থামিয়ে দিয়েছি। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে বলেছেন ঃ "যদি তুমি কারও প্রভাব ও জাঁক-জমকে ভীত হও, তবে শীঘ্র উযূ করে নিবে এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে উযূ করার

নির্দেশ দিবে। কেননা, যে ব্যক্তি উযূ করে নেয়, আমি তাকে নিরাপত্তার আশ্রয় দান করি।" দরবেশ বললেন ঃ "এজন্যেই আমি দরজা বন্ধ রেখেছি এবং নিজে উযূ করেছি, পরিবার-পরিজনকে উযূর নির্দেশ দিয়েছি, আর আমি নামাযও পড়েছি। ফলে, আমরা সকলেই আল্লাহ্র নিরাপত্তায় আশ্রিত হওয়ার পর আপনার জন্য দরজা খুলেছি।"

অধ্যায় ঃ ৬৩

নামাযের ফযীলত

সমস্ত ইবাদতের মধ্যে নামায যেহেতু শ্রেষ্ঠতম এবং অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, তাই, পবিত্র কুরআনের রীতি (পুনঃ অবতারণা) অনুসারে পুনরায় নামাযের আলোচনা করা গেল।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَا اُعْطِيَ عَبْدٌ عَطَاءً خَيْرًا مِنْ اَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِيْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيْهِمَا۔

'দুই রাকাত নামায পড়ার তওফীক হওয়া বান্দার উপর (আল্লাহ্ পাকের) সবচেয়ে বড় এহ্সান।'

মুহাম্মদ ইব্নে সীরিন (রহঃ) বলেন ঃ আমাকে যদি দুই রাকাত নামায অথবা বেহেশ্ত এই দুইয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার এখ্তিয়ার দেওয়া হয়, তাহলে আমি দুই রাকাত নামাযকেই গ্রহণ করবো। কারণ, এতে রয়েছে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি, আর বেহেশ্ত প্রাপ্তিতে রয়েছে আমার সন্তুষ্টি।'

বর্ণিত আছে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা সাত-আসমান সৃষ্টি করেছেন, তখন ফেরেশ্তাদের দ্বারা তা সম্পূর্ণ ভরপুর করে দিয়েছেন। তারা সকলেই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে মগ্ন। কেউ এক মুহূর্তের জন্যেও ইবাদত থেকে অন্যমনস্ক হয় না।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক আসমানের ফেরেশ্তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ইবাদত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং এক আসমানের ফেরেশ্তাগণ আপন আপন পদভরে দাঁড়িয়ে ইবাদতরত রয়েছেন ; এভাবে তাঁরা কেয়ামতের সিঙ্গা ফূঁক দেওয়া পর্যন্ত থাকবেন। আরেক আসমানের ফেরেশ্তাগণ রুকূ অবস্থায় রয়েছেন। অপর এক আসমানের ফেরেশ্তাগণ সেজদায় পড়ে রয়েছেন। অনুরূপ, আরেক আসমানের ফেরেশ্তাগণ আপন

আপন ডানা বিছিয়ে আল্লাহ্র মহানত্ব ও অসীম গুণাবলীর প্রকাশে ব্যাপৃত রয়েছেন। ইল্লিয়্যীন ও আরশের ফেরেশ্তাগণ আরশে মু'আল্লা'র চতুর্পার্শ্বে তওয়াফরত রয়েছেন—এমতাবস্থায় তারা আল্লাহ্র গুণ-কীর্তন ও তসবীহ-তাহলীল এবং দুনিয়াবাসীদের জন্য মাগফেরাতের দো'আয় নিমগ্ন থাকছেন। মুসলমানদের ফযীলতময় বৈশিষ্ট্যের কারণে উপরোক্ত সর্ববিধ ইবাদতকে তাদের জন্য এক নামাযের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করে দিয়েছেন। অধিকন্তু তাদেরকে কুরআন মজীদ তেলাওয়াতের সবিশেষ ইবাদতের তওফীক দানে ভূষিত করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা ও হক আদায়ের জন্য যাবতীয় শর্ত ও নিয়ম-নীতি অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের হুকুম করেছেন।

যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

"ঐ মুত্তাকীগণ এমন যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করে অদৃশ্য বস্তুসমূহের প্রতি এবং নামায কায়েম করে, আর আমি তাদেরকে যা রিযিক প্রদান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে।" (বাক্বারাহ্ ঃ ৩)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلاَةَ

"এবং নামায কায়েম কর।" (মুয্যাম্মিল ঃ ২০)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَقِمِ الصَّلاَةَ

"এবং নামায কায়েম করুন।" (হূদ ঃ ১১৪)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلاَةَ

"এবং যারা রীতিমত নামায আদায়কারী।" (নিসা ঃ ১৬২)

কুরআন মজীদের সর্বত্র যেখানেই নামাযের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে, সেখানেই 'নামায কায়েম করা'র কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে নামাযের বিষয় এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

"অতএব, বড় সর্বনাশ ঐ সকল নামাযীর জন্য, যারা নিজেদের নামাযকে ভুলে থাকে।" (মাউন ঃ ৪,৫)

অর্থাৎ, মুনাফেকদেরকে শুধু নাম মাত্র নামায পাঠকারী বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে, প্রকৃত মু'মিনদেরকে 'নামায কায়েমকারী' বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, নামায অনেকেই পড়ে, কিন্তু নামায কায়েমকারীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। গাফলত ও অবহেলাভরে নামায পাঠকারীরা কেবল প্রথানুরূপ আমল করে যায়, তারা এ বিষয় আদৌ চিন্তা করে না যে, আমার নামায আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে অনেক নামাযী এমন রয়েছে, যাদের নামাযের মাত্র এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশ বা এক ষষ্ঠাংশ—এভাবে এক দশমাংশ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন—আমলনামায় লেখা হয়।' অর্থাৎ নামাযের মধ্যে যে ক্ষুদ্রাংশে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে মন নিবিষ্ট থাকে, কেবল সেই ক্ষুদ্র অংশটুকু কবূল হওয়ার যোগ্য হয়।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি হুযূরে ক্বাল্ব অর্থাৎ একাগ্রতা সহকারে দুই রাকাত নামায পড়ে, সে সদ্যপ্রসূত সন্তানের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যায়।

বস্তুতঃ আল্লাহ্র দরবারে নামায কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যখন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে নিজেকে নিমজ্জিত করে নামায পড়া হবে। যদি এরূপ নাহয় ; বরং নামাযের মধ্যে নানাবিধ চিন্তা ও অহেতুক কল্পনার অবতারণা হয়, তবে এর দৃষ্টান্ত হবে এরূপ,— বাদশাহ্র দরবারে কেউ স্বীয় অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনার মানসে দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান হলো, ঠিক যে সময় বাদশাহ্ উপস্থিত হলেন, তখন ক্ষমা প্রার্থনাকালে যদি সে এদিক সেদিক তাকাতে থাকে অথবা অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, তবে বাদশাহ্ তার

প্রার্থনা কতটুকু কবূল করবেন? বাদশাহ্র প্রতি তার ধ্যান ও মনোযোগ যতটুকু, তার আবেদন বা প্রার্থনাও ঠিক ততটুকু কবূল করা হবে। নামাযের বিষয়টিও ঠিক তদ্রূপ ; অন্যমনস্ক হয়ে অবহেলা ভরে নামায পড়লে, তা আল্লাহ্র দরবারে কবূল হবে না।

স্মরণ রেখো, নামাযের উদাহরণ হচ্ছে ওলীমার ন্যায় ; বাদশাহ্ লোকদিগকে ওলীমার দাওয়াত দিচ্ছেন, রাজকীয় দাওয়াত, আয়োজনও তদ্রূপ—নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের সমাহার। অনুরূপ, আল্লাহ্ তা'আলা লোকদেরকে নামাযের প্রতি আহ্বান করেছেন এবং এতে রয়েছে সর্বপ্রকার আমল ও যিকির। সুতরাং নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্র ইবাদত করা মূলতঃ সর্ববিধ ইবাদতের আস্বাদ গ্রহণ করা। মনে কর, নামাযের আমলসমূহ সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যাদি আর যিকির বা তসবীহসমূহ সুমিষ্ট পানীয় বস্তু।

বর্ণিত আছে, নামাযের মধ্যে বার হাজার খাছলত বা গুণ-বিশেষণ রয়েছে এবং তৎসমুদয় গুণাবলীকে মাত্র বারটি খাছলতের মধ্যে জমা করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তির নামাযের প্রতি আসক্তি আছে এবং বার হাজার খাছলত বা গুণাবলী সম্বলিত নামায পড়তে চায়, সে যেন বারটি খাছলতকে হৃদয়ঙ্গম করে পরিপূর্ণভাবে অন্তরে গেঁথে নেয়। এভাবে নামায পড়লে, তবে সে নামাযই হবে কামেল ও মুকাম্মাল নামায। তন্মধ্যে ছয়টি খাছলত নামায আরম্ভ করার পূর্বের সাথে সম্পর্কিত আর ছয়টি খাছলত নামাযের ভিতরগত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। প্রথমোক্ত ছয়টি খাছলত হলো ঃ

এক, ইলম ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ইলম সহকারে যদি স্বল্প আমলও করা হয়, তবে তা জাহালতের বা অজ্ঞতার অধিক আমলের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

দুই, উযূ ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ হচ্ছে, "উযূ ব্যতীত নামায হয় না।"

তিন, লেবাস ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"প্রত্যেকবার মসজিদে উপস্থিত হওয়াকালে নিজেদের পোষাক পরিধান করে নাও।" (আ'রাফ ঃ ৩১)

অর্থাৎ, নামাযের সময় লেবাস গ্রহণ কর বা উন্নত পোষাক পরিধান কর।

চার, সময় ঃ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ۝

"অবশ্যই মুমিনদের উপর নামায নির্ধারিত সময়ে ফরয।" (নিসা ঃ ১০৩)

অর্থাৎ, নির্ধারিত সময়ে নামায পড়া ফরয।

পাঁচ, কেবলা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ফরমান ঃ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ط

"আপনার চেহারা মসজিদে-হারামের (কা'বার) দিকে ফিরিয়ে নিন। আর তোমরা যেখানেই থাক, স্বীয় চেহারা ঐ দিকেই ফিরাও।" (বাক্বারাহ ঃ ১৪৪)

ছয়, নিয়্যত ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'প্রত্যেক আমলই নিয়্যতের উপর নির্ভর করে। সুতরাং যার নিয়্যত যেরূপ হবে, তার আমলও সেরূপ হবে।'

অপর ছয়টি খাছলত যা নামাযের ভিতরগত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, তা নিম্নরূপ ঃ

এক, তকবীর ঃ হাদীস শরীফে আছে, 'তকবীর হচ্ছে নামাযের তাহ্রীমাহ্।' অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার' দ্বারা নামায আরম্ভ হয় এবং নামায ব্যতীত অন্যান্য কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আর সালামের দ্বারা নামায হতে বের হয়ে অন্যান্য কাজের জন্য অনুমতিপ্রাপ্তি হয়।

দুই, ক্বিয়াম বা দাঁড়ান ঃ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ۝

"আল্লাহ্র সম্মুখে বিনয়ী অবস্থায় দণ্ডায়মান হও।" (বাক্বারা ঃ ২৩৮)

তিন, সূরা ফাতেহা ঃ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ط

"যে পরিমাণ কুরআন সহজে পাঠ করা যায়, পাঠ কর।" (মুযযাম্মিল ঃ ২০)

চার, রুকূ ঃ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَارْكَعُوْا

"তোমরা রুকূ কর।" (বাক্বারাহ্ ঃ ৪৩)

পাঁচ, সেজদা ঃ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَاسْجُدُوْا

"তোমরা সিজ্দা কর।" (ফুচ্ছিলাত ঃ ৩৭)

ছয়, কুউদ নামাযের বৈঠক ঃ হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ নামাযরত ব্যক্তি সর্বশেষ সেজদার পর তাশাহুদ পরিমাণ সময় বসবে—এতে তার নামায পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে।

উপরোক্ত বারোটি খাছলত নামাযের ভিতর সন্নিবেশিত হওয়ার পর সিলমোহরের প্রয়োজন। আর তা হলো, **এখলাস**। নামাযের প্রত্যেকটি খাছলত আদায়ের সময় এখলাসের প্রতি সনিষ্ঠ দৃষ্টি রাখলে সেগুলো পরিপূর্ণ ভাবে মোহরযুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝

"আপনি খাঁটি বিশ্বাসে আল্লাহ্র ইবাদত করতে থাকুন।" (যুমার ঃ ২)

সেইসঙ্গে নামাযের পরিপূর্ণতার জন্য ত্রিবিধ ইলম অর্জন করাও অপরিহার্য। প্রথমতঃ নামাযে কি কি আমল ফরয এবং কি কি সুন্নত স্পষ্টভাবে সেগুলো জানা। দ্বিতীয়তঃ উযূর ফরয ও সুন্নতসমূহ জানা। উযূর এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে উযূর সমাধা করবে এবং এ উযূর দ্বারা যে নামায পড়বে, তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত নামায হবে। তৃতীয়তঃ শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া এবং হিম্মতের সাথে তা প্রতিহত করা।

উযূর পরিপূর্ণতা হাসিল হয় তিনটি বিষয়ের দ্বারা। এক,—হিংসা-বিদ্বেষ ও ধোঁকা-প্রতারণা থেকে অন্তর পবিত্র করে নিবে। দুই,—দেহকে পাপাচার হতে পবিত্র করে নিবে। তিন,—উযূর জন্য পানি ব্যয় করতে কোনরূপ অপচয় করবে না।

পোষাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা হাসিল হয় তিনটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখলে। এক,—হালাল মালের দ্বারা পোষাক তৈরী করবে। দুই,—পোষাক বাহ্যিক না-পাকী থেকে পবিত্র থাকা চাই। তিন,—পোষাক সুন্নত মুতাবেক হওয়া চাই ; অহংকার ও লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে না হওয়া চাই।

নামাযের জন্য সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখার বিষয়টির হাসিল হবে এ তিনটি বিষয়ে অভ্যস্থ হলে ঃ এক,—তোমার দৃষ্টি যেন চাঁদ, সূর্য ও তারকার প্রতি থাকে; যখনই নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখনই তা পড়ে নিবে। দুই,—তোমার কর্ণ সর্বদা আযানের অপেক্ষায় থাকবে। তিন,—তোমার অন্তরে সময়ের গুরুত্ব থাকতে হবে এবং তৎপ্রতি মনোযোগী ও ধ্যানমান হবে।

ক্বেবলারুখ হওয়ার ব্যাপারে তিনটি বিষয় বিদ্যমান থাকতে হবে ঃ এক,—চেহারা ক্বেবলার দিকে থাকবে। দুই,—অন্তর আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকবে। তিন,—আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে খুশূ-খুযূ সহকারে বিনয়াবনত থাকবে।

নিয়্যতের পরিপূর্ণতার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে ঃ এক,-যখন যে নামায পড়ার ইচ্ছা করবে প্রারম্ভেই সেই নামাযকে নির্ধারণ করে নিবে এবং অন্তরে তা' উপস্থিত রাখবে। দুই,—অন্তরে এই ধ্যান দৃঢ় করে নিবে যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং তিনি আমাকে দেখছেন। অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়-ভীতি সহকারে নামাযে দণ্ডায়মান হবে। তিন,—নামাযরত অবস্থায় মনের অবস্থার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে—শয়তান যেন পার্থিব চিন্তা-কলহের কুমন্ত্রণায় ফেলে তোমাকে ওয়াসওয়াসাগ্রস্ত না করতে পারে।

তকবীর বা 'আল্লাহু আকবার' বলার পরিপূর্ণতা লাভ হয় তিনটি বিষয়ের দ্বারা ঃ এক,—বিশুদ্ধ উচ্চারণে দৃঢ়ভাবে তকবীর বল। দুই,—কান বরাবর

উভয় হস্ত উত্তোলন কর। তিন,—তকবীরের সময় অন্তর যেন নামাযে উপস্থিত থাকে, এ সময় আল্লাহ্ তা'আলার বড়ত্ব ও মহানত্বের ধ্যান করবে।

নামাযে ক্বিয়াম বা দাঁড়ানোর পরিপূর্ণতার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা অপরিহার্য ঃ এক,— তোমার চোখের দৃষ্টি সেজদার স্থানে নিবদ্ধ থাকবে। দুই,—অন্তর আল্লাহ্‌র পাকের ধ্যানে মগ্ন থাকবে। তিন,-ডানে-বামে তাকাবে না।

ক্বেরাআতের পরিপূর্ণতার জন্য তিন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। এক,-ধীর-স্থির ও শান্তভাবে সহীহ্‌শুদ্ধ ও সুন্দর প্রক্রিয়ায় সূরা ফাতেহা পড়বে। দুই,—চিন্তা-ফিকির সহকারে তেলাওয়াত করবে ; অর্থের প্রতি মনোযোগ সহকারে ধ্যান করবে। তিন,—নামাযে যা পড়, বাস্তব জীবনে সে অনুযায়ী আমল করবে।

রুকূর পরিপূর্ণতার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্যঃ এক,—পৃষ্ঠদেশ সোজা-বরাবর রাখবে ; একদিক উচু অপরদিক নীচ যেন না-হয়। দুই,—উভয় হস্ত হাঁটুর উপর এমনভাবে স্থাপন করবে যেন হাতের অঙ্গুলিসমূহ ফাঁক ফাঁক থাকে। তিন,—শান্তভাবে রুকূ করবে এবং তসবীহ্ পড়ার সময় আল্লাহ্‌র মহানত্বের ধ্যান করবে।

নামাযে কা'দা বা বৈঠকের পরিপূর্ণতার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে ঃ এক,—বাম পায়ের পাতার উপর বসবে এবং ডান পা সোজা খাড়া করে রাখবে। দুই,—তাশাহুদের দো'আ পড়বে এবং এতে আল্লাহ্‌র মহত্ত্বের প্রতি ধ্যান করবে, নিজের জন্য এবং সমগ্র ঈমানদারদের জন্য দো'আ করবে। তিন,—নামায পূর্ণ হওয়ার পর সালাম ফিরাবে।

সালামের পূর্ণতা লাভ হয় এভাবে—সত্যিকার আন্তরিকতা ও গভীর উপলব্ধি নিয়ে সালাম ফিরাবে। ডান দিকে সংরক্ষক ফেরেশ্‌তাগণ, উপস্থিত মুসল্লীবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে সালাম ফিরাবে। বাম দিকে সালাম ফিরাতেও অনুরূপে নিয়্যত করবে। সালাম ফিরানোর সময় দুই কাঁধ পর্যন্ত দৃষ্টি সীমিত রাখবে।

এখলাসের পরিপূর্ণতার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এক,—একমাত্র আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য নামায পড়বে ; অন্য কারও সন্তুষ্টি বা লৌকিকতা যেন উদ্দেশ্য না-হয়। দুই,—একথা একীন করবে যে, নামায

এবং সমস্ত নেক আমলের তওফীক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই প্রদত্ত; আমার নিজের কৃতিত্ব বলতে কিছুই নাই। তিন,—পঠিত নামাযের হেফাযত ও সংরক্ষণে সর্বদা সচেষ্ট ও সতর্ক থাকবে—নিজের কোন ত্রুটি বা পাপাচারের কারণে যেন নষ্ট না হয়ে যায়। বরং ক্বিয়ামতের দিন যেন এই নামায কাজে আসে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ

"যে ব্যক্তি নেক আমল নিয়ে এসেছে।' (কাসাস ঃ ৮৪)

উক্ত আয়াতে এ কথা বলেন নাই ঃ مَنْ عَمِلَ بِالْحَسَنَةِ ('যে ব্যক্তি নেক আমল করেছে।') সুতরাং আল্লাহ্‌র দরবারে নামায নিয়ে হাজির হওয়ার জন্য এর সংরক্ষণ জরুরী।

অধ্যায় ঃ ৬৪

ক্বিয়ামতের বিভীষিকা

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছি—ইয়া রাসূলুল্লাহ্, ক্বিয়ামতের দিন কি বন্ধু বন্ধুকে স্মরণ করবে? তিনি বলেছেন ঃ "ক্বিয়ামতের দিন তিন জায়গায় কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। এক. মীযান-পাল্লার নিকট ; যে পর্যন্ত না সে জানতে পারবে যে, তার পাল্লা হালকা রয়েছে কি ভারী হয়েছে। দুই. আমলনামা বিতরণের সময় ; যে পর্যন্ত না সে জানতে পারবে যে, আমলনামা সে ডান হাতে প্রাপ্ত হবে কি বাম হাতে। তিন. যখন দোযখের মধ্য থেকে বিরাট-বিশাল একটি গর্দান বের হয়ে তাদেরকে অগ্নির লেলিহান শিখায় আবদ্ধ করে নিবে এবং বলতে থাকবে যে, আল্লাহ্ আমাকে তিন ধরনের লোকের উপর ন্যস্ত করে দিয়েছেন, দুনিয়াতে যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে মাবূদ বানিয়েছে, আর অবাধ্যতা ও হঠকারিতা করেছে, আর যারা ক্বিয়ামতের দিনকে অবিশ্বাস করেছে। এই তিন শ্রেণীর লোকদেরকে সে পেঁচিয়ে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করবে। জাহান্নামের একটি পুল রয়েছে চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম তরবারীর চেয়েও ধারালো— এতে রয়েছে অগ্রভাগ বাঁকানো আঁকড়া বা লৌহ-শলাকা ; উপরন্তু কাঁটাদার ছোট ছোট চারা গাছ।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টি করার সময়ই (ক্বিয়ামতের) সিঙ্গা সৃষ্টি করেছেন এবং তা হযরত ইস্রাফিল (আঃ)-এর হাতে দিয়ে রেখেছেন। তিনি আরশের দিকে তাকিয়ে অপলক নেত্রে প্রতীক্ষা করছেন যে, কখন ফুৎকারের আদেশ করা হয়। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া

রাসূলাল্লাহ্, সিঙ্গা কি? তিনি বললেন ঃ নুরের শিং। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তা কেমন? তিনি বললেন ঃ ঐ সত্তার কসম, যিনি আমাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন, আসমান-যমীনের প্রশস্ততা জুড়ে এর পরিধি ; তিনবার এতে ফুৎকার দেওয়া হবে— নফ্‌খায়ে ফাযা' (ভয়-বিভীষিকা ও ত্রাসের ফুৎকার), নফ্‌খায়ে সা'ক্ব (বেহুঁশকরণের ফুৎকার) এবং নফ্‌খায়ে বা'ছ (পুনরুত্থানের ফুৎকার)। আর এই শেষোক্ত ফুৎকারে আত্মাসমূহ (রূহ্) বের হবে। তখন এমন দেখা যাবে, যেন অসংখ্য-অগণিত মক্ষিকায় আসমান-যমীন ভরে গেছে। অতঃপর এসব রূহ্ (আত্মা) নাকের ছিদ্র-পথ দিয়ে দেহসমূহে প্রবেশ করবে। এরপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি সে ব্যক্তি যার কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ (উন্মুক্ত) হবে। অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জিব্‌রাঈল, মিকাঈল ও ইস্রাফিল (আঃ)-কে যখন যিন্দা করা হবে, তখন তাঁরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের পার্শ্বে গিয়ে উপস্থিত হবেন। তাঁদের নিকট থাকবে (হুযূরের আরোহণের জন্য) বুরাক্ব, আরও থাকবে জান্নাতের পোষাক। কবর মুবারক বিদীর্ণ হওয়ার পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করবেন, হে জিবরাঈল। আজকে এ কোনদিন ? তিনি বলবেন, আজকে ক্বিয়ামত-দিবস। হক-নাহাকের ফয়সালার দিবস। ক্বারিয়াহ্ তথা করাঘাতকারীর দিবস। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, হে জিব্‌রাঈল! আল্লাহু তা'আলা আমার উম্মতের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বল্‌বেন, আপনি সুসংবাদ নিন ; সর্বপ্রথম আপনার কবরই বিদীর্ণ হয়েছে।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহু তা'আলা বল্‌বেন ঃ "হে জ্বিন ও মানবকুল! আমি তোমাদের মঙ্গল চেয়েছি, এই নাও তোমাদের কর্মফল তোমাদের আমলনামায় রয়েছে। যদি ভাল হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা কর। আর যদি বিপরীত কিছু পাও, তবে অন্য কাউকে নয় নিজকেই ভর্ৎসনা কর।"

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে রাযী (রহঃ)-এর মজলিসে এক ব্যক্তি এ আয়াতখানি তিলাওয়াত করেছিল ঃ

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ۝ وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ۝

"যেদিন আমি মুত্তাকীদেরকে করুণাময়ের নিকট মেহ্‌মানরূপে একত্রিত করবো, আর পাপীদের তৃষ্ণার্ত অবস্থায় দোযখের দিকে তাড়িয়ে নিবো।" (মারয়াম ঃ ৮৬)

অর্থাৎ পাপীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পায়ে হাঁটিয়ে নেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন ঃ "হে লোকসকল! কোথায় দৌড়াচ্ছ—থাম, থাম ; এইতো আগামীকল্যই তোমাদেরকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে। চতুর্দিক থেকে তোমরা দলে দলে উপস্থিত হতে থাকবে এবং আল্লাহ্‌র সম্মুখে একা একা দন্ডায়মান হবে। জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজ সম্পর্কে তোমাদেরকে অক্ষরে অক্ষরে জিজ্ঞাসা করা হবে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে জামাআত-বন্দী অবস্থায় পরম করুণাময়ের মহান দরবারে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। আর পাপীদেরকে পায়ে হাঁটিয়ে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় কঠিন আযাবের সোপর্দ করা হবে ; দলে দলে তারা দোযখে প্রবেশ করবে। ওহে ভাইয়েরা আমার! তোমাদের সামনে এমন একদিন রয়েছে, যে দিনটির পরিমাণ তোমাদের গণনা অনুযায়ী পঞ্চাশ হাজার বছর দীর্ঘ হবে। সে দিনটি হবে প্রকম্পনকারী সিঙ্গা-ফুঁকের দিন। মহা বিভীষিকাময় ক্বিয়ামতের দিন। বিশ্বজগতের রব্বের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার দিন। লজ্জা, অনুতাপ, অনুশোচনা ও হায় আফ্‌সূস করার দিন। চুলচেরা ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব-নিকাশের দিন। দুঃখ-দৈন্য অভাব-অনটন ও ঘাট্‌তি-কম্‌তির দিন। চিৎকার, আহাজারি ও আর্তনাদের দিন। হক ও সত্য প্রকাশিত হওয়ার দিন। উত্থান ও পুনর্জীবিত হওয়ার দিন। আপন কৃতকর্ম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার দিন। লাভ-লোকসান চূড়ান্ত হওয়ার দিন। চেহারা কালো কিংবা সাদা হওয়ার দিন। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে না আসার দিন- তবে হ্যাঁ, যারা পবিত্র আত্মা নিয়ে উপস্থিত হবে। অনাচারীদের উযর-আপত্তি কোন কাজে না আসার ; উপরন্তু তাদের উপর অভিশাপ ও খারাবী বর্ষিত হওয়ার দিন।"

হযরত মুকাতিল ইবনে সুলাইমান (রহঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন সমগ্র মখ্‌লূক একশত বছর নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকবে ; কোনই কথা বলবে না। একশত বছর গভীর অন্ধকারে বিপন্ন ও দিশাহারা হয়ে থাকবে। আর একশত বছর উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় পরস্পর উলট-পালট খেতে থাকবে আর স্বীয় রব্বের নিকট কাতর মোকদ্দমা নিবেদন করতে থাকবে। পক্ষান্তরে, পঞ্চাশ হাজার বছর বিলম্বিত দিনটি নিষ্ঠাবান মুমিনের উপর একটি হালকা ফরয নামাযের ন্যায় স্বল্প সময়ে অতিবাহিত হয়ে যাবে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ اَرْبَعَةِ اَشْيَاءَ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَ اَفْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهٖ فِيْمَ اَبْلَاهُ وَعَنْ عِلْمِهٖ فِيْمَ عَمِلَ بِهٖ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ اَنْفَقَهُ ـ

"(হাশরের দিন) বান্দাকে চারটি প্রশ্ন না করা পর্যন্ত তার পদদ্বয় আপন জায়গা থেকে নড়বে না ঃ এক. তার জীবন কি কাজে ব্যয় করেছে? দুই. তার শরীরকে কি বিষয়ে সে জীর্ণ করেছে? তিন. যে বিদ্যা সে অর্জন করেছে, সেই অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? চার. ধন-দৌলত কোথা হতে উপার্জন করেছে এবং তা কিভাবে ব্যয় করেছে?"

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "প্রত্যেক নবীকে একটি মকবূল দো'আর অধিকার দেওয়া হয়েছে। সকল নবী তা দুনিয়াতেই গ্রহণ করে নিয়েছেন। কিন্তু আমি তা আখেরাতে আমার উম্মতের শাফা'আতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছি।"

আয় আল্লাহ! আমাদেরকেও তোমার প্রিয় হাবীবের শাফা'আত নসীব কর। আমীন॥

অধ্যায় ঃ ৬৫

দোযখ ও মীযান-পাল্লার বয়ান

একই বিষয়ের আলোচনা ইতিপূর্বে যদিও হয়েছে, বিষয়বস্তু পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে পুনঃআলোচনা করা যেতে পারে। কেননা হতে পারে এ পুনরাবৃত্তির ওসীলায় উদাসীন ও বিধ্বস্ত হৃদয়সমূহের যথেষ্ট উপকার হবে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনেও দোযখ ও কিয়ামতের বিভীষিকার উল্লেখ বারবার করেছেন, যাতে বিবেকবান লোকদের এ থেকে উপকৃত হওয়া সহজতর হয়। আর এ বিষয়েও যেন সতর্কীকরণ হয়ে যায় যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ছাড়া সবকিছুই বৃথা ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ এবং একমাত্র আখেরাতের জীবনই সর্বতঃ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।

আল্লাহ্ তা'আলা আপন অনুগ্রহ ও দয়াগুণে আমাদেরকে দোযখ থেকে হেফাযত করুন—দোযখের ভয়াবহতা সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, দোযখের অভ্যন্তর ভীষণ কালো-অন্ধকার ; আলোর নাম-নিশানাও সেখানে নাই। দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে। প্রতিটি দরজায় সত্তর হাজার পাহাড় রয়েছে। প্রতিটি পাহাড়ে সত্তর হাজার আগুনের শাখা রয়েছে। প্রতিটি শাখায় সত্তর হাজার আগুনের কুণ্ড রয়েছে। প্রতিটি কুণ্ডে সত্তর হাজার আগুনের উপত্যকা রয়েছে। প্রতিটি উপত্যকায় সত্তর হাজার আগুনের অট্টালিকা রয়েছে। প্রতিটি অট্টালিকায় সত্তর হাজার সর্প এবং সত্তর হাজার বিচ্ছু রয়েছে। প্রতিটি বিচ্ছুর সত্তর হাজার লেজ রয়েছে। প্রতিটি লেজের সত্তর হাজার বিষ-থলি রয়েছে। যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন এ সবকিছু থেকে পর্দা অপসারণ করা হবে। এগুলো বিরাটকায় প্রাচীর হয়ে জ্বিন ও মানবকুলের ডানে, বামে, সম্মুখে, উপরে এবং পিছনে উড়তে থাকবে। এহেন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দেখে জ্বিন ও মানবকুল ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উপুড় হয়ে পড়ে যাবে এবং চিৎকার করে বলতে থাকবে—পরওয়ারদিগার! বাঁচাও, বাঁচাও।